তমস্বিনী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

"মরণ আর কি!"

"নে, ন্যাকামি রাখ্! আমাদের কাছে আর নুকোতে হবে না। আর্‌সির গোড়ায় গিয়ে একবার দেখ্, মুখে আর হাসি ধর্‌চে না।"

"মর্ ছুঁড়ি, হাস্‌লাম আবার কখন!" বলিয়া যে প্রথমে কথা কহিয়াছিল সে দ্বিতীয়াকে চিম্‌টী কাটিল। যেখানে উরু কোমল ও মাংসল, সেইখানে দুটী কোমল অঙ্গুলি দিয়া চিম্‌টী কাটিল।

চিম্‌টী অনেক রকম, চিম্‌টীর নামও অনেক রকম। তবে চলিত রাম চিম্‌টী আর শ্যাম চিম্‌টী। রামের চেয়ে শ্যামের জ্বালা বেশী। এটা শ্যাম চিম্‌টী।

"উহু গেলাম!" বলিয়া যে চিম্‌টী খাইয়াছিল সে একটা পাল্‌টা চিম্‌টী কাটিল। তার পর দুইজনে চিম্‌টীর স্থানে হাত বুলাইতে লাগিল ও হাসিতে লাগিল।

বলিতে হইবে কি যে ইহারা দুইজনই অল্পবয়স্কা? বুড়ীরা কি পরস্পরে তামাসা করিয়া চিম্‌টী কাটে?

এ রকম তামাসার একটা বয়স আছে। যৌবনের মুখে সমস্ত শরীরে কেমন একটা অস্থিরতা হয়। যন্ত্রণায় একটা কেমন মধুরতা থাকে। অন্তরটিপ্‌নীতে কেমন সর্ব্ব শরীরে সুখ বোধ হয়। চিম্‌টীর জ্বালার সঙ্গে শরীরের মধ্যে কেমন চিন্ চিন্ করিয়া ওঠে—বেশ লাগে। তাই সমবয়সী তরুণীদের মধ্যে গা টিপাটিপির এত ঘটা, চিম্‌টীর এত ছড়াছড়ি।

যে দুইজন পরস্পরকে চিম্‌টী কাটিয়া হাসিতেছিল তাহারা সমবয়সী। বয়সে ঠিক সমান নয়, কেন না একজনের বয়স চতুর্দ্দশ বৎসর আর একজনের অষ্টাদশ। যে প্রথম কথা কহিয়াছিল সেই বয়ঃকনিষ্ঠা। কিন্তু দুইজনে এক ডিঙ্গীর যাত্রী, একই তরঙ্গে দুইজনে নাচিতেছিল। জীবনের জল যৌবনের বসন্ত বাতাসে তরঙ্গিত হইতেছিল। সেই হিসাবে দুইজনে সমবয়সী।

চতুর্দ্দশবর্ষীয়ার নাম চারুবালা। আর একজনের নাম মুক্তকেশী। দুইজনের পাশাপাশি বাড়ী, খিড়কীর দরজা দিয়া সর্ব্বদা যাতায়াত আছে। দুইজনে অনেক দিনের ভাব। চারু-

বালার যখন বিবাহ হয় তখন মুক্তকেশী কনে সাজাইতে প্রধান উদ্যোগী। বাসর জাগিতে আর বরকে ঠাট্টা করিতেও সে প্রধান। দুইজনে নিত্যই দেখা হয়, দেখা হইলেই মনের কথা হয়।

আজকের কথাটা এই। আজ চারুর বরের আসিবার কথা। তাহার বরের সঙ্গে এই সবে নূতন ভাব হইয়াছে। মাঝে তাহার বর কোথায় গিয়াছিল, কিছু দিন এখানে ছিল না। চারুবালার বর ফিরিয়া আসিয়াছে ও আজ রাত্রে আসিবে শুনিয়া মুক্ত সাত তাড়াতাড়ি আসিয়াছিল। ইচ্ছা, চারুকে একটু ক্ষেপাইবে।

তা, সে জন্য মুক্তর বাড়ী বহিয়া আসিবার আবশ্যক ছিল না। সে আসিয়া দেখিল চারু আগে হইতেই ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। বর আসিবে বলিয়া বাড়ীর লোক তাহার পিছনে লাগিয়াছে। মুক্ত আসিলে চারু তাহাকে লইয়া একটা আলাদা ঘরে গিয়া বসিল। মুক্তর কথার জ্বালা যেমন মধুরতা তেমান।

মুক্ত বলিল, "আজ রাত্রে তোর ঘরে আড়ি পাত্‌ব।"

চারু বলিল, "তা পাতিস্। আমি আলো নিবিয়ে শোব। অন্ধকার নইলে আমার ভাল ঘুম হয় না।"

"কবে থেকে লো? আলো নিবে গেলে ভূতের ভয়ে আঁৎকে উঠিস্ যে! তা আজকে আঁধারি ঘরের মাণিক আস্‌বে বটে।"

"তা না হয় আলো নিভাব না, তুই সারা রাত বসে

থাকিস্। আমি ত আর কিছু কর্‌ব না, যেমন রোজ রাত্রে শুয়ে থাকি তেম্‌নি ঘুমিয়ে থাক্‌ব।"

"ওরে আমার খুকি! তা রাত্রে যখন কেঁদে উঠ্‌বি তখন তোর বরকে তুলোয় করে দুধ খাইয়ে দিতে বল্‌ব।"

"দূর পোড়ারমুখি! আমরা তবু পদে আছি, তোর মত এখনো বেহায়া হইনি।"

"আমার আবার বেহায়াপনা কখন দেখ্‌লি?"

"কেন, সে দিন তোর বরের কাছে গান কোরেছিলি, এ বাড়ী ও বাড়ীর সকলেই শুনেছিল। তুই আর কথা কোস্‌নে।"

মুক্ত হাসিতে লাগিল। কহিল, "আমাদের আর অত বাড়াবাড়ির বয়স নেই। তোদের এখন নতুন বয়স, তোদের সব সাজে।"

চারু তার সে কচি কচি মুখখানি বড় গম্ভীর করিয়া কহিল, "আহা, তা ত বটেই! তিন কাল গিয়ে এখন এক কালে ঠেকেছে। তা আর এখানে থেকে কি হবে? বুড়ো সোয়ামী নিয়ে কাশীবাসী হওগে।"

বাস্তবিক, মুক্ত নিজেও বেশ জানিত যে তাহার যৌবনের ভরা জোয়ারে এখনও ভাটা ধরে নাই। তাহার প্রধান কারণ মুক্তকেশীর এ পর্য্যন্ত সন্তান হয় নাই, হইবার বড় আশাও ছিল না। লোকে তাহাকে বন্ধ্যা বলিত। থম্‌থমে জোয়ারের জল যেমন কূলে কূলে পূরিয়া আসে তেমনি

মুক্তকেশীর যৌবন পূরিয়া আসিয়াছিল। তাহাতে সে আবার দোজবরের হাতে পড়িয়াছিল। দোজবরে নামে মাত্র, কারণ মুক্তর স্বামীর বয়সও অধিক নয়, এবং প্রথম পক্ষ হইতে সন্তানাদিও কিছু ছিল না। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর যে জ্বালা মুক্তর সেটা ছিল না, আদরটুকু সমস্তই ছিল।

কেবল একটা বড় জ্বালা ছিল। মুক্তকেশীর শরীরে নিত্য বাঁধা যৌবন, তাহাতে বরটীই একটু পর হইয়া পড়িয়াছিল। এমন স্বামী অনেক আছে যাহাদের চক্ষে স্ত্রীর নিত্য নব যৌবন সহ্য হয় না। দু দিন যুবতী রহিল, তাহার পর গণ্ডা দুই ছেলেপুলে হইল, গোল ফুরাইল। তার পর চলনসই এক রকম ঘর করা হয়। কিন্তু বন্ধ্যা স্ত্রী, যুবতী, সুন্দরী, ঘরে থাকা বড় বিপদ। রাত্রিদিন সামাল সামাল, রাত্রিদিন সাবধান। মুক্তকেশীর এই একটা জ্বালা ছিল।

দুই জনে এই রকম কথাবার্ত্তা হইতেছিল এমন সময় সেই ঘরে আর একটী বালিকা আসিল। বালিকার দ্বাদশ বৎসর। নাম স্বর্ণময়ী। চারুবালার পিসতুত তাহাকে দেখিয়া মুক্ত ব্যঙ্গ করিয়া কহিল, "ক মুখখানি বড় শুকিয়ে গেছে। চারুর ব আস্‌বে আর ও বেচারির বিয়ের সম্বন্ তা তুই ভাবিস্‌নে, আমরা সব যো বিয়ে দেব এখন।"

স্বর্ণ কহিল, "আমায় নিয়ে কেন আবার মুক্ত দিদি ? রাঙা দিদিকে জ্বালাচ্চ ওকেই জ্বালাও।"

মুক্ত চাপিয়া ধরিল, "আচ্ছা, তুই সত্য কথা বল্ দেখি, তোর বিয়ে কোর্‌তে ইচ্ছে করে কি না।"

"তোমার গায়ে হাত দিয়ে বল্‌চি একটুও না।"

"মাইরি ?"

"মাইরি !"

চারু মুক্তকে কহিল, "তুইও কি পাগল হলি না কি ? ও কি নিজের মুখে বল্‌বে যে ওর বিয়ে কর্‌বার বড় ইচ্ছে হয়েছে ?"

স্বর্ণ কহিল, "মাইরি ভাই রাঙা দিদি, আমার বিয়ে কর্‌বার এতটুকুও ইচ্ছে নেই।"

"তবে কি কোর্‌বি ?"

"কেন, মার কাছে থাক্‌ব।"

"চিরকাল আইবুড়ো থাক্‌বি না কি ?"

এক "তা রইলুমই বা !"

বুড়ো সো[illegible] হাঁদি ! অমন অলক্ষণে কথা কি বল্‌তে আছে ?"

বাস্তবিক [illegible]সময় চারুর দিদি তাহাকে ডাকিল। "বেলা গেল, ভরা জোয়ারে [illegible] আয় !"

কারণ মুক্তকেশীর [illegible]ল। বলিল, "যাই ভাই, বাড়ী যাই, আশাও ছিল না। লো[illegible] থেকে এসে যদি না দেখ্‌তে পায় জোয়ারের জল যেমন কু[illegible] না।"

চারু হাসিয়া কহিল, "তাতে আর তার দোষ কি? তোমার মত রূপসী যুবতীকে না দেখ্‌তে পেলে আর রাগ হবে না? তোমায় একা রেখে আপিসে কি কোরে যায় তাই ভাবি!"

মুক্তকে অকারণে তাহার স্বামী মাঝে মাঝে সন্দেহ করে অনেকে তাহা জানিত। চারুর শেষের কথাটার লক্ষ্য সেই কথার উপর। মুক্ত অবশ্য বুঝিতে পারিল। "তুই আর কাটা ঘায়ে নূনের ছিটে দিস্‌নে," বলিয়া, হাসিয়া, চোক ঘুরাইয়া, রূপের ঢেউ তুলিয়া মুক্তকেশী চলিয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।
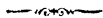
স্বর্ণময়ীর বয়স যখন আট বৎসর তখন তাহার পিতৃ-বিয়োগ হয়। সেই পর্য্যন্ত সে মাতুলালয়ে থাকিত। চারু-বালার পিতা স্বর্ণময়ীর মাতুল। স্বর্ণময়ীর মাতার সন্তান হইবে না হইবে না করিয়া এই একটী কন্যা হইয়াছিল। সেই মেয়েটী লইয়া তিনি বিধবা হইলেন। ভাই বড় মানুষ। বিধবা, কন্যাকে লইয়া, ভ্রাতার আশ্রয়ে রহিলেন। স্বর্ণময়ীর বিবাহের ভারও মাতুলের উপর পড়িল।

প্যারীমাধব রায় স্বর্ণময়ীর মাতুল। কলিকাতায় প্যারী-মাধব বাবু একজন জানিত লোক। তাঁহার অপেক্ষা ধনী আরও অনেকে ছিল, কিন্তু তাঁহার মত বড়মানুষী অনেকে করে নাই। ইদানী একটু সাবধান হইতে আরম্ভ করিয়া-ছিলেন। অর্থাগমও পূর্ব্বের অপেক্ষা কমিয়া আসিতেছিল।

চারুবালা তাঁহার আদরের মেয়ে। তাহার বিবাহে বিস্তর ব্যয় হইয়াছিল। এখন স্বর্ণময়ীর বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য, সেও বড় হইয়া উঠিতেছিল। প্যারীমাধব ও তাঁহার গৃহিণী একটু ইতস্ততঃ করিতেছিলেন।

স্বর্ণময়ীর মাকে অনেকে অনেক রকম কথা বলিত।

তিনি সাহস করিয়া দু একবার কন্যার বিবাহের কথা ভ্রাতার সম্মুখে পাড়িয়াছিলেন। প্যারীমাধব কহিতেন, "তুমি কোন চিন্তা করিওনা। আমি চারুর যেমন বিবাহ দিয়াছি স্বর্ণেরও সেই রকম করিয়া বিবাহ দিব।" ভ্রাতার মুখে এমন কথা শুনিয়া স্বর্ণের মাতা আর কিছু বলিতে পারিতেন না।

বিবাহের কথা মাঝে মাঝে হয় কিন্তু পাকা সম্বন্ধ কোথাও হয় না। প্যারীমাধব বাবুর ইচ্ছা ধনীর ঘরে স্বর্ণময়ীর বিবাহ হয়। ধনী না হইলে সম্বন্ধ তুল্য হয় না। কিন্তু ধনীর গৃহ হইতে সম্বন্ধ বড় আসে না। প্যারীমাধব বাবুর নিজের কন্যা হইলে কোন চিন্তা থাকিত না। কিন্তু বিধবার কন্যাকে কোন্ ধনী ঘরে লইবে?

কথায় বলে লক্ষ কথা নহিলে বিবাহ স্থির হয় না। এক লক্ষ ছাড়া দশ লক্ষ কথা হইল তবু স্বর্ণময়ীর সম্বন্ধ স্থির আর হয় না। এই দশ লক্ষ কথার কয়েক সহস্র কথা স্বর্ণও শুনিল।

স্বর্ণ ও তাহার মাতার শয়নগৃহ স্বতন্ত্র ছিল। এক রাত্রে শয়নকালে স্বর্ণ বলিল, "মা!"

"কি মা!"

ঘরের কোনে মিটি মিটি প্রদীপ জ্বলিতেছিল। সেই আলোকে মাতা দেখিলেন কন্যার চক্ষু দুইটি ছল ছল করিতেছে, জলে পূরিয়া আসিয়াছে।

ব্যস্ত হইয়া মাতা কন্যাকে কাছে টানিয়া লইলেন।

বিধবার এই এক মাত্র ধন। স্বর্ণ একটু চুপ করিয়া রহিল দেখিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে মা ?"

স্বর্ণ তখন মুখ তুলিয়া মার দিকে চাহিল। বড় বড় চোক, চোকের কোলে জল। কহিল, "মা, তোমরা সব আমার বিয়ে দেবার জন্য এত ব্যস্ত হয়েছ কেন ?"

সচরাচর এমন কথা মেয়ে মাকে জিজ্ঞাসা করে না, কিন্তু ইহাদের কথা আলাদা। বিধবা মাতা ও তাহার এক মাত্র কন্যা, ইহাদের পরস্পরের নিকট প্রায় কোন কথাই গোপন করিবার থাকে না।

স্বর্ণময়ীর কথা শুনিয়া মাতা একটু হাসিলেন, স্বর্ণের মাথায় হাত দিয়া কহিলেন, "পাগলি, ব্যস্ত হব না ? তুই কি এখন আর ছোট্টটি আছিস্ ? এখন বিয়ে না দিলে লোকে যে নিন্দা কর্‌বে !"

স্বর্ণময়ী কহিল, "বিয়েতে কি সুখ মা ? আমার বিয়ে হলে আমি শ্বশুরবাড়ী যাব, তোমায় আর দেখ্‌তে পাবনা। তুমিও তখন এক্‌লা থাক্‌বে, তোমার কাছে কে থাক্‌বে ?"

তখন মাতার চক্ষে জল ভরিয়া আসিল, কহিলেন, "তা কি কর্‌ব মা ! মেয়ে ত' চিরকালই পরের বাড়ী যায় !"

"কেন মা, বিয়ে কি না হলেই নয় ? তোমায় ছেড়ে আমি কখন থাক্‌তে পার্‌ব না !"

মাতা ক্ষীণ হাসিয়া কহিলেন, "অমন সবাই বলে মা, তার পর দু দিন শ্বশুর ঘর কর্‌লে সব ভুলে যায়।"

তখন স্বর্ণময়ী বলিবার কিছু খুঁজিয়া পায় না। কিন্তু কিছুতেই বিবাহের কথা তাহার ভাল লাগিতেছিল না। তাহার সমুদয় প্রকৃতি, তাহার হৃদয়, তাহার শরীর যেন বিবাহের কথায় পীড়িত হইতে লাগিল। তাহার ব্যথিত হৃদয় হইতে উত্তর আসিল, "বিয়ের জন্য এত কেন মা? শেষে আমার যদি তোমার মত দশা হয়!"

এই কথা শাণিত ছুরিকার ন্যায় জননীর হৃদয়ে বিদ্ধ হইল। ঘরের প্রদীপ যেন নিভিয়া গেল, অন্ধকারে নানাবিধ বিকট শব্দে যেন তাঁহার শ্রবণ পীড়িত হইতে লাগিল। কন্যার মুখ ভুলিয়া গেলেন, এখনকার অবস্থা ভুলিয়া গেলেন। ঝঞ্ঝাতাড়িত সমুদ্র-তরঙ্গের তুল্য পূর্ব্বকথাসমূহ স্মৃতিসমুদ্রে উদিত হইতে লাগিল।

স্বর্ণময়ীর মাতা কোন কথা কহিলেন না, কেবল স্থির বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া রহিলেন। নিঃশব্দে, স্থির চক্ষু হইতে গণ্ড বহিয়া দর দর ধারা ঝরিতে লাগিল।

তখন আর কোন কথা স্বর্ণের মনে রহিল না। মাতার গলা জড়াইয়া ধরিয়া, কপোলে কপোল রাখিয়া, মাতার অশ্রু নিজের কপোল দ্বারা মুছাইয়া দিয়া রুদ্ধ, ভগ্ন স্বরে কহিল, "কেঁদ না মা! আমি তোমার পাগল মেয়ে, আমার কথায় কি কাঁদ্তে আছে? কেঁদ না মা, তোমার দুটি পায়ে পড়ি! আমি আর কখন কিছু বল্‌ব না!"
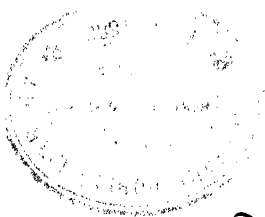
তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

শ্রীমতি মুক্তকেশী চারুবালার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া গজেন্দ্র গমনে যখন গৃহে উপস্থিত হইলেন তখন কর্ত্তা মহাশয় শ্রীমান্ শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় আঁটা পোষাকে দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিলেন। এই মাত্র আপিস হইতে আসিয়াছেন, মাথায় কালো মখমলের টুপি রহিয়াছে, টুপির নীচে ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘাম। বাবু দাঁড়াইয়া গৃহিনীর পথ দেখিতেছিলেন।

শ্যামাচরণের বয়স চৌত্রিশ বৎসর। টুপি খুলিলে মাথার মাঝখানে একটু টাক দেখা যায়। মাঝারি গড়নের মানুষ, মানানসই নেয়াপাতি ভুঁড়ি, রং শ্যামবর্ণ। গোঁফের একটু বাহুল্য আছে, দাড়ি কামান।

শ্যামাচরণ একটী ছোট রকম চাকরি করেন। বাড়ীতে আর কেহ নাই, স্ত্রী আর এক বিধবা মাসী। মাসী রাঁধেন; গৃহকর্ম্মের জন্য এক জন দাসী।

গল্প করিতে করিতে মুক্তকেশীর অতটা জ্ঞান ছিল না যে এত বেলা গিয়াছে। এমন গল্প কিছু রোজ হয় না। চারুবালার শরীর ও মনে যে আনন্দ তাহার একটা তরঙ্গ যেন মুক্তর অঙ্গেও লাগিয়াছিল।

চারুকে ডাকাডাকি না করিলে হয়ত মুক্ত আরও খানিক বসিয়া থাকিত। শ্যামাচরণও আজ একটু সকাল আসিয়াছিলেন।

কর্ত্তার সে তোলোপানা মুখখানা দেখিয়াই মুক্ত বুঝিতে পারিল যে লক্ষণ ভাল নয়। এখন উপায়? নিজের মুখখানা ত আগে লুকান উচিত। থতমত খাইয়া মুক্ত ঘোমটা টানিয়া দিল। ঘোমটার ভিতরে সঙ্কুচিত হইয়া, পাশ কাটাইয়া অন্য দিকে যাইবার উপক্রম করিল।

কিন্তু মুক্তর ঠোঁটে সে টিপি টিপি হাসি আর তার চোকে সে ঢুলু ঢুলু ভাব কর্ত্তা দেখিয়াছিলেন। এমন মুখের ভাব কেন? শ্যামাচরণ রাগিয়া কহিলেন, "আমায় দেখে ঘোম্‌টা দেবে না কেন? আর আমি চোকের আড়াল হলেই খেম্‌টা নাচ!"

ঘোম্‌টা দিবার বিশেষ কোন কারণ ছিল না। মাসী ছিলেন রান্নাঘরে ও দাসী ছিলেন ময়রার দোকানে। শ্যামাচরণের গলার আওয়াজ শুনিয়া মাসী একবার উঁকি মারিয়া দেখিলেন, তার পর দ্যাবা দেবীকে দেখিয়া আবার আগের মত পটল চিরিতে বসিলেন।

সম্ভাষণের ঘটাখানা দেখিয়া মুক্ত ফিরিয়া স্বামীর নিকট আসিল। শ্যামাচরণ সিঁড়ীর কাছে দাঁড়াইয়াছিলেন। মুক্তর ঘোম্‌টা একটু সরিয়া গিয়াছিল। একবার স্বামীর দিকে চাহিয়া তাঁহার চাপকানের হাতা ধরিয়া একটু টানিল। কহিল, "যা

বল্‌বার হয় উপরে এসে বল। উঠানে দাঁড়িয়ে ঢলাঢলি না কোর্‌লেই কি নয়?"

মুক্তকেশী উপরে উঠিয়া গেল। কথা যাহা কহিয়াছিল তাহা চুপি চুপি মুখ বাড়াইয়া। কথা গুলি ও সেই সঙ্গের ঈষদুষ্ণ নিশ্বাস শ্যামাচরণের জাঁকাল গোঁফ জোড়ায় জড়াইয়া গেল।

শ্যামাচরণও মনে করিলেন, উপরে যাওয়াই ভাল। মন্দ কথা যাহাকে বলা যায় তাহার সম্মুখে না বলিলে তৃপ্তি হয় না। শ্যামাচরণও উপরে গেলেন। মুক্তকেশী যে তাঁহার কাপড় টানিয়া গিয়াছিল সেই টানেই আসলটা তিনি উপরে উঠিলেন!

উপরে ছোট ছোট দুটি কুঠুরী। একটীতে কর্ত্তা গৃহিণী শয়ন করেন, আর একটীতে জিনিস পত্র। কর্ত্তার জল খাবার ও খাওয়া দাওয়াও সেই ঘরে চলে। বাহির বাড়ীতে লোক জন বসিবার একটী ঘর। মাসী নীচেই থাকিতেন, উপরে বড় একটা আসিতেন না।

উপরে খাবার ঘরে একটী তক্তপোষ ছিল। তাহার পাশে মুক্তকেশী ঘোম্‌টা খুলিয়া দাঁড়াইয়াছিল। শ্যামাচরণ আসিয়া বসিলেন না, উদ্ধত স্বরে কহিলেন, "কোথায় যাওয়া হয়েছিল?"

মুক্তর ঠোঁটের কোণে সেই হাসি টুকু লাগিয়াছিল। কহিল, "কোথায় যাই তুমি কি জান না?"

"রোজ রোজ পাড়া না বেড়ালে বুঝি চলে না? আর আমি যখন বাড়ী থাকি না সেই সময় বুঝি বেড়ান মনে পড়ে?"

"এর নাম কি পাড়া বেড়াতে যাওয়া? চারুদের বাড়ী যাই, আর ত কোথাও যাইনে।"

"হাঁ! চারু ত একটা ছুতা! ওদের বাড়ী রূপ দেখ্‌বার অনেকে আছে কিনা তাই রূপ দেখাতে যাওয়া হয়।"

এ সব ঝগড়া ঝাঁটির কথা। মুক্ত ঝগড়া করিতে না জানে এমন নয় কিন্তু এখন তাহার ঝগড়া করিবার মোটেই ইচ্ছা ছিল না। কহিল, "তোমার কেবল ঐ এক কথা! কেন, রূপ দেখান ছাড়া কি আর কোন কাজ নেই? আর রূপই বা কি ছাই!"

ছাই আর পাঁশ হউক রূপই মুক্তর বিপদ আর রূপই তাহার বল! সেই রূপ দেখিয়া ভাল মানুষ শ্যামাচরণ সন্দিগ্ধ হইতেন, আবার সেই রূপের মোহেই সব ভুলিয়া যাইতেন। সন্দেহ, কারণ মুক্ত একটু চপলস্বভাব, সৌন্দর্য্যাভিমানিনী। তাহার রূপ দেখিয়া অপরের লুব্ধ হওয়া বিচিত্র নয়। শ্যামাচরণের সে ছোট বাড়ী খানিতে অতটা রূপ মানাইত না। তাই শ্যামাচরণের ভয় হইত। আরও ভয় মুক্তকেশীর সন্তান হয় নাই বলিয়া। ক্রমেই তাহার রূপ বাড়িতেছিল, সর্ব্ব শরীরে সৌন্দর্য্য যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। যদি জগতে সে রূপ দেখিবার আর কেহ না থাকিত তবেই শ্যামাচরণ স্থির হইতে পারিতেন। কিন্তু এখন কেবল ভয়, কেবল সংশয়, কেবল মনের ব্যথা। এত যন্ত্রণার যে কারণ সমুদয় সুখেরও সেই কারণ।

মুক্ত-ত মুখে বলিল "রূপ ছাই," আর কাজে! আ ছি! ছি!

রূপসীর এত খলকপটও আসে! মুক্ত কপট রাগের ভান করিয়া মুখখানি এমনি করিল যে রূপের দুই একটী উপকরণ যাহা এদিক ওদিক ছড়াইয়া পড়িয়াছিল সব আসিয়া একত্র হইল। সে মুখ দেখিয়া কি চুপ করিয়া থাকা যায়? শ্যামাচরণের সে মুখখানি দেখিয়া ইচ্ছা হইতে লাগিল——কিন্তু তখনও তাঁহার রাগ পড়ে নাই। কহিলেন, "চিরকাল দেখ্‌তে ষোলবছুরীর মত থাক্‌লে কি চিরকাল স্বভাবও সেই রকম থাক্‌তে হয়?"

তখন মুক্তকেশীর মূর্ত্তি ফিরিল, কহিল, "দেখ, তোমার কথা শুনে এমনি ঘেন্না হয়, নিশ্চয় কোন দিন গলায় দড়ি দিয়ে মর্‌ব।" মুক্ত কাঁদিল না কিন্তু তাহার চোকের পাতায় দু ফোঁটা জল মুক্তর মত টল টল করিতে লাগিল।

শ্যামাচরণ অমনি নরম হইয়া গেলেন, বলিলেন, "আমি আর তোমায় কি এমন মন্দ কথা বলেছি! পাছে লোকে নিন্দা করে তাই একটু সাবধান কোরে দিই।" বলিয়া তক্তপোষে ঝুপ্ করিয়া বসিয়া পড়িলেন।

এইটা যুদ্ধ বিরতির লক্ষণ। বসিয়া আর ঝগড়া ভাল হয় না। মুক্ত আর একটু স্বামীর কাছে আসিল, আঁচলের একটুখানি কোণ তুলিয়া চোকের কোলে দিল, কহিল, "নিন্দা কর্‌বার মধ্যে তুমি। আর কেউ কখন একটা কথাও বলে না, তুমি বিনা দোষে মিছিমিছি যা বল্‌বার নয় তাই বল। তুমি যদি কেবলই এমন কথা বল তা হলে আমার মরণই ভাল!"

হাজার হউক মুক্তকেশী দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী, তাহাতে আবার সুন্দরী। শ্যামাচরণ তাড়াতাড়ি উঠিয়া মুক্তর হাত ধরিলেন, কহিলেন, "আমি রাগের মাথায় কি বলি, তুমি কিছু মনে কোরো না। এবার যা হবার হয়েছে আর কখন তোমায় কিছু বল্‌ব না। তুমি চোকের জল ফেল না, লক্ষ্মীটি।"

মুক্ত চোকের জল ফেলিল না, কহিল, "তা তুমি যদি বারণ কর তা হলে না হয় আর চারুদের বাড়ী যাব না।"

তাহাও বলিতে শ্যামাচরণের সাহস হইল না। এত কালের আলাপ ধাঁ করিয়া বন্ধ করা যায় না। বলিলেন, "না, না, তা কেন? যাওয়া আসা মাঝে মাঝে কর্‌বে তার আর কি!

কাপড় ছাড়িয়া জল খাবার খাইয়া পান চিবাইতে চিবাইতে শান্তমূর্ত্তি শ্যামাচরণ যখন আবার তক্তপোষে বসিলেন তখন মুক্ত-কেশী আসিয়া তাঁহার পাশে বসিল। কহিল, "ওদের বাড়ী কেন আজ দেরি হল জান?"

"না বল্‌লে কেমন কোরে জান্‌ব?"

"আজ চারু'র বর আস্‌বে সেই কথাবার্ত্তা হচ্ছিল।"

"তা এতক্ষণ বল্‌তে নেই বুঝি! তাই বল! চারুর নবীন বরটী, ভাগ বসাতে ইচ্ছে হবে না কেন বল! তাতে আবার তোমার কপালে এক বুড়ো দোজবরে মিন্সে জুটেছে।"

"আ মরি! এত রঙ্গও জান! তোমার কাছে একটা কথা বলে পার পাবার জো নেই!" বলিয়া মুক্ত স্বামীকে একটা ঠেলা দিল। ঠেলা দিতে গিয়া—সাধ করিয়াই হউক আর হঠাৎই হউক—নিজে শ্যামাচরণের কোলে পড়িয়া গেল। তখন যাহা হইবার তাহাই হইল। শ্যামাচরণ স্ত্রীর মুখ চুম্বন করিলেন। তাঁহার বড় বড় গোঁফে মুক্তর গাল ও গলা শুড়্ শুড়্ করিতে লাগিল। সে হাসিয়া উঠিয়া বসিল। কহিল, "তোমার যে গোঁপ!"

"কেটে ফেল্‌ব না কি?"

"উনি সব কাজ প্রায় আমার কথায় করেন কি না!"

আসলটা মুক্তর এমন ইচ্ছা ছিল না যে শ্যামাচরণ গোঁফ কাটিয়া ফেলেন। শ্যামাচরণ ও তাহা জানিতেন। তামাসা করিয়া মুক্ত কতবার স্বামীকে বলিত, "দেখ, এক দিন তুমি ঘুমিয়ে থাক্‌বে আর আমি তোমার গোঁপ কাঁচি দিয়া কেটে দেব।"

শ্যামাচরণও হাসিয়া বলিতেন, "তা হলে ঘুম থেকে উঠে আমি তোমার নাক কেটে দেব।"

কিন্তু শ্যামাচরণের গোঁফ ও মুক্তকেশীর নাক দুই এ পর্য্যন্ত বজায় ছিল।

শ্যামাচরণের সে রাগ কোথায় গেল? রমণী স্পর্শ মাত্র যে বল হরণ করে সেটা কি মিথ্যা কথা? এমন যে শক্ত-মাটী শ্যামা-

চরণ তিনি এক ফোঁটা চক্ষের জলে আর একটু অঙ্গস্পর্শে গলিয়া কাদা হইয়া গেলেন। তখন সে কাদায় যাহা ইচ্ছা তাহাই গড়িতে পারা যায়। ইচ্ছা হয় শিব গড়, ইচ্ছা হয় বানর গড়। সুন্দরীরা পূজা করিবার সময় শিব পূজাই বেশী করেন কিন্তু গড়িবার সময় বানরের সংখ্যাই অধিক !

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

চারুবালার খুব বড় মানুষের ঘরে বিবাহ হইয়াছিল। তাহার বরের নাম রজনীকান্ত। বয়স বিশ বৎসর, দেখিতে মন্দ নয়। বর্ণ গোর নয় কিন্তু মুখের শ্রী ভাল আর এদিকে ভাল মানুষ। রজনীকান্তের পিতার অগাধ সম্পত্তি, কিন্তু তাঁহার দুইটা গুণ (না দোষ?) ছিল। স্বভাবটা কিছু কৃপণ ও সন্তানদিগের প্রতি শাসন কিছু কঠিন। শুধু সন্তানেরা কেন, কর্ত্তা মহাশয়ের ভয়ে বাড়ী শুদ্ধ লোক কাঁপিত। নামকরণের সময় বাপ মা নাম রাখিয়াছিলেন দীনবন্ধু, কিন্তু স্বভাবটা সে রকম হয় নাই। দীনবন্ধু বাবুর রাশ বড় ভারি, এমন কি চারুবালার বাপ পর্য্যন্ত বেহাই মহাশয়কে একটু ভয় করিতেন।

সেই জন্য রজনীকান্ত বড় মানুষের ছেলে হইয়াও বিশেষ কোন রকম বড়মানুষী চাল শিখিতে পারে নাই। বাড়ীতে সব বিষয়ে কড়াক্কড়, ছেলে উপযুক্ত হইলেও বাপকে জুজুর মত ভয় করিত। বাড়ীর গাড়ী করিয়া রজনীকান্ত স্কুলে যাইত ও সেই গাড়ী করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিত। অনুমতি ব্যতীত আর কোথাও যাইবার সাধ্য ছিল না। বাড়ীতে মাষ্টার পড়াইতে আসিত; সে কিছু দিন পূর্ব্বের কথা।

এই রকম ধরা বাধায় রজনীকান্তের স্বভাব নির্দ্দোষ ছিল। কেবল কপালের দোষে বুদ্ধি একটু স্থূল। মাজিয়া ঘসিয়া সেটা আর সূক্ষ্ম হয় নাই। দীনবন্ধু বাবু বার কয়েক ধমক চমক দিয়া কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই। ধমকে বুদ্ধি বাড়ে না, যে টুকু বা থাকে তাহাও লোপ পায়। ছেলে যে পড়াশুনায় বিশেষ ভাল হইবে দীনবন্ধু সে আশাও বড় রাখিতেন না। পাছে একেবারে মন্দ হইয়া যায় এই তাঁহার ভয়।

রজনীকান্ত জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিন চার বৎসর হইল বিবাহ হইয়াছে। মাষ্টারের উৎপাত এবং স্কুলের হাঙ্গামাও নিবৃত্ত হইয়াছে। এখন পূর্ব্বের মত আর তত কঠিন শাসন নাই, কিন্তু অভ্যাসবশতঃ ছেলে বাপকে আগের মতই ভয় করিত।

গৃহিণীও কর্ত্তার ভয়ে কাঁটা, কিন্তু পুত্রবধূকে আর বাপের বাড়ী রাখা ভাল দেখায় না এ কথাটা মধ্যে মধ্যে তিনি কর্ত্তাকে স্মরণ করাইয়া দিতেন। দীনবন্ধু সে কথায় বড় একটা কান দিতেন না। দুই একবার চারুবালাকে শ্বশুর বাড়ী লইয়া গিয়াছিল, কিন্তু যখন বাপের বাড়ীর লোক আনিতে যায় তখন কর্ত্তা নিজে তাহাকে পাঠাইয়া দিতেন। তাঁহার মনের কথাটা তিনি কাহাকেও বলিতেন না। কথাটা আর কিছু নয়, তাঁহার ইচ্ছা যে পুত্র ও বধূ আর কিছু দিন পৃথক থাকে। আজ কালের ছেলে গুলা নিতান্ত স্ত্রৈণ হইয়া যায়। দীনবন্ধু নিজে স্ত্রৈণ ছিলেন না, সুতরাং পুত্র স্ত্রৈণ হয় এমন তাঁহার ইচ্ছা ছিল না।

দীনবন্ধুর সৌভাগ্যক্রমে পত্নীবিয়োগ হয় নাই অতএব দ্বিতীয় পক্ষে প্রবীণ পুরুষেরাও কেন এমন স্ত্রৈণ হয় সে কথা তাঁহাকে বিবেচনা করিতে হয় নাই।

এ পর্য্যন্ত চারুবালার বেশী দিন শ্বশুর ঘর করা হইয়া উঠে নাই। সে জন্য তাহার বিশেষ ক্ষোভও ছিল না। সে বাপের বাড়ীর আদুরে মেয়ে, শ্বশুর বাড়ী যাইবার জন্য বড় ব্যস্ত নয়। সহরে শ্বশুর বাড়ী হইয়া একটা সুবিধা হইয়াছিল, যখন তখন ক্রিয়াকর্ম্মের সময় দুই বাড়ীই আসা যাওয়া করিতে পারিত। তবু অবশেষে মেয়ে মানুষের শ্বশুর ঘরই নিজের ঘর। একবার ভাল করিয়া চিনিলে বাপের বাড়ী আর তেমন মন টিঁকে না। দু দিনের তরে আসিলে অসুবিধা বোধ হয়, মনটা কেমন খুঁৎ খুঁৎ করে।

চারুবালার এখনও সে-দিন আসে নাই। শ্বশুর বাড়ী যাই-বার বড় ইচ্ছাই হইত না। কিন্তু তবু তাহার মন একটু চঞ্চল হইয়াছিল। নবীন দম্পতীর পরস্পর দর্শনানুরাগ বাড়িতেছিল। রজনীকান্ত জামাই মানুষ, তাহাতে আবার এ কালের মত জামাই নয়। আপনা আপনি শ্বশুর বাড়ী যাওয়া, কিম্বা বিনা নিমন্ত্রণে রাত্রে চাঁদ মুখ খানি দেখিবার জন্য উপস্থিত হওয়া—এ সব রজনীকান্তের ছিল না। নিজের ইচ্ছায় যত না হউক বাপের ভয়ে রজনীকান্তকে এইরূপ করিতে হইত। আবার শ্বশুর বাড়ী নিত্য নিশি যাপনের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা ভাল দেখায় না, এমন

নিমন্ত্রণ করিতেও আসে না। এইরূপ নানা কারণে সে কালের মানুষ না হইয়াও রজনীকান্ত কতকটা সে কালের জামাইয়ের মত। এ জন্য শ্বাশুড়ী মহলে তাহার বিস্তর সুখ্যাতি এবং শ্যালী মহলে কিছু নিন্দা ছিল।

কালে ভদ্রে এই রকম দেখা এই জন্য এই নবদম্পতীর প্রেম এ পর্য্যন্ত তেমন প্রগাঢ় ও মুক্ত হইতে পারে নাই। লজ্জায় দুই জনের হৃদয় কিছু সঙ্কীর্ণ ছিল। রাত্রে প্রদীপ নিভাইয়া না শুইলে দুই জনের লজ্জা করিত, একটু বেশী চোকোচোকি হইলে দুই জনে চক্ষু নত করিত, পরস্পরের সহিত একটু জোরে কথা কহিতে সাহস হইত না। যে দিন রজনীকান্তের নিমন্ত্রণ হইত সে সহজে শয়ন করিতে যাইত না, বৈঠকখানায়, কিম্বা বাহিরের আর কোন ঘরে বসিয়া বাড়ীর ও পাড়া সম্পর্কের শ্যালা বাবুদের সহিত গাল গল্প করিত। ডাকাডাকির পর অনেক রাত্রে শুইতে যাইত। শুইতে অনিচ্ছা নয়, নিন্দার ভয়। চারুবালারও সেই গতি। তাহাকেও অনেক সাধাসাধি করিয়া ঘরে শোয়াইয়া দিয়া আসিতে হইত। কোন কোন দিন মুক্ত থাকিত, কিন্তু অত রাত্রে নিজের ঘর শূন্য রাখিয়া সে বড় একটা আসিতে পাইত না, রাত্রে শ্যামাচরণও তাহাকে সহজে চক্ষের আড়াল করিতেন না।

কিন্তু প্রায়ই চারুবালাকে আগে গিয়া শুইতে হইত। খানিক ক্ষণ সে চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিত তার পর রজনীকান্ত আসিত।

আবার এ দিকে খুব ভোরে, কোন কোন দিন কাক না ডাকিতে উঠিয়া চলিয়া যাইত। সেও কেবল নিন্দার ভয়ে। চারুবালা কোন কোন দিন টের পাইত না রজনীকান্ত কখন উঠিয়া চলিয়া যাইত। যেমন অল্পে অল্পে লজ্জা ঘুচিতে লাগিল অমনি ক্রমে ক্রমে দুই জনেরই একটা অভাব বোধ হইতে লাগিল। এক এক দিন চারুবালার অভিমান হইত, রজনীকান্ত আসিলে তাহার সহিত কথা কহিত না, পাশ ফিরিয়া বিছানার এক ধারে শুইয়া থাকিত।

রজনীকান্ত কাছে গিয়া একটু অপরাধীর মত জিজ্ঞাসা করিত, "কেন, কি হয়েছে? আমার উপর আবার রাগ কেন?"

অভিমানিনীর মুখে কথাই নাই।

রজনীকান্ত তখন গা ঠেলা দিয়া বলিত, "আমি এতদিন অন্তর একবার কোরে আসি তাতেও কি রাগ? তা না হয় আর আস্‌ব না।"

চারুবালা মড়ার মত।

রজনী মানভঞ্জন শাস্ত্রে তেমন পণ্ডিত নয়। সে বেচারি আস্তে আস্তে গিয়া বিছানার আর এক পাশে শয়ন করিত।

সে ঘুমাইয়া পড়ে দেখিয়া চারুবালার মুখ ফুটিত। বলিত, "আমি কি তোমায় আস্‌তে বারণ করি যে তুমি অমন কথা বল্‌চ?"

"আবার কি কোরে বারণ কোর্‌বে? মাস খানেক পরে যদি

এলাম ত আমার সঙ্গে কথাই কবে না। আর কি দূর দূর কোরে তাড়িয়ে দেবে? তা না হয় যদি ইচ্ছে হয় ত তাই দাও! বাকি আর থাকে কেন?"

"মাগো, আমি কি তাই বল্লুম! তোমার কেমন মন, সব কথাই যেন উল্টা বুঝ্‌তে হয়!"

বলিতে মানিনীর কথা একটু জড়াইয়া আসিল। তখন রজনীকান্ত তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিল।

এখন, চোকোচোকি হইলেই দুই জনের হাসি পায়। চোকে চোক মিলিতেই দুই জনের মুখে হাসি দেখা দিল। রজনীকান্ত আবার গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে সত্যি বল না?"

অমনি অভিমান উথলিয়া উঠিল, লজ্জা টুটিয়া গেল। "তুমি সকাল বেলা উঠে চলে যাও আমায় কি একবার বলেও যেতে নেই!"

"তাই এত রাগ!"

রজনীকান্ত সেয়ানা হইলে রাগের কারণ গোড়াতেই বুঝিতে পারিত, কিন্তু সে একটু বোকা কি না, প্রেমবৈচিত্র্য সব সময় শীঘ্র বুঝিতে পারিত না।

এমনতর রাগারাগি যে দিন হইত সে দিন তার পর আদরেরও কিছু বাড়াবাড়ি হইত; সকাল বেলা বিদায়ের পালাটাও তেমন সংক্ষিপ্ত হইত না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

এককালে প্যারীমাধব রায় খুব সৌখীন লোক ছিলেন। সহরে যত রকম আমোদ ছিল সমস্তই উপভোগ করিয়াছিলেন। এখন বয়স হইয়াছে, বৃহৎ পরিবারের চিন্তা, অর্থচিন্তা এই রকম নানা কারণে আর তেমন আমোদপরায়ণ ছিলেন না। কিন্তু বন্ধুমহলে রসিক লোক বলিয়া তাঁহার পসার ছিল ও তিনি নহিলে আমোদ ভাল জমিত না। এ জন্য সর্ব্বদাই তাঁহার নিমন্ত্রণ হইত, কিন্তু সকল সময় তিনি নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারিতেন না। কখন শরীর অসুস্থ, কখন গৃহিণী যাইতে দিতেন না। পূর্ব্বে স্ত্রীর কথা প্যারীমাধব কানেই তুলিতেন না, কিন্তু এখন স্ত্রীর বশীভূত হইতেছিলেন। লোকে এমন পর্য্যন্ত বলিত যে তাঁহার কান পাতলা। আগে ছিল না, এখন হইয়াছে।

সব সময় কিন্তু বন্ধু বান্ধবের কথা এড়ান যায় না। এক দিন একজন বড় জমীদারের বাড়ী প্যারীমাধবের নিমন্ত্রণ হয়। উপলক্ষ আর কিছু নয় কেবল পাঁচ জন বন্ধু মিলিয়া আমোদ করা। প্যারীমাধব যাইবেন কি না ভাবিতেছিলেন। গৃহিণী বড় চাপিয়া

ধরিয়াছিলেন, কিছুতেই যাইতে দিবেন না। বৈকালে জলখাবার সময় প্যারীমাধব গৃহিণীর কথায় সায় দিলেন, কহিলেন, "আজ বাড়ীতেই থাব। নিমন্ত্রণে যাব না।"

গৃহিণী শুনিয়া আনন্দিত হইলেন।

সন্ধ্যার সময় প্যারীমাধব বৈঠকখানায় অন্যমনস্ক হইয়া বসিয়া আছেন, সট্‌কার নল পাশে পড়িয়া রহিয়াছে, এমন সময় নীচে কে জিজ্ঞাসা করিল, "ওরে, বাবু বাড়ী আছেন?" এক জন চাকর উত্তর দিল, "আছেন।" আর অন্য কথার অপেক্ষা না করিয়া সে ব্যক্তি উপরে উঠিয়া আসিল। প্যারীমাধবকে দেখিয়া কহিল, একলাটী বসে যে!"

প্যারীমাধব উঠিয়া আগন্তুকের সহিত জোরে সেক্‌হাণ্ড করিলেন। অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "বিলক্ষণ! গোবিন্দ কোথা থেকে! তোমার ত এখন দেখা পাবারই জো নেই! বস, বস!"

গোবিন্দচন্দ্র বসু এক জন প্রধান রাজকর্ম্মচারী। রাজকর্ম্মে বিশেষ প্রশংসিত। যেমন কর্ম্মদক্ষ তেমনি পণ্ডিত। কিন্তু আমোদ পাইলে আর কাণ্ডজ্ঞান থাকিত না। কতক লোকে এই কারণে তাঁহার গ্লানি করিত। কেহ বলিত সঙ্গ দোষে তাঁহার এমন দশা। ইয়ার লোকে বলিত গোবিন্দ বাবুর প্রাণ বেশ সাদা।

গোবিন্দচন্দ্র বসিয়া অভ্যাসবশতঃ আল্‌বোলার নলটা মুখে

দিলেন। বার কয়েক টানিয়া মুখ বিকৃত করিয়া কহিলেন, "কিছু নেই, পুড়ে গিয়েছে।"

প্যারীমাধব ডাকিলেন, "ওরে তামাক দিয়ে যা!"

পান তামাকু আসিলে পর গোবিন্দচন্দ্র কহিলেন, "তুমি যে বড় নিঝুম হয়ে বসে আছ? ব্যাপারখানা কি?"

"কি আর কোর্‌ব? শরীরটা তেমন ভাল নেই তাই চুপ কোরে বসে আছি।"

"শরীরের কথায় আর কাজ কি! শরীরং ব্যাধিমন্দিরং। আর তোমার শরীরের অপরাধই বা কি বল!"

প্যারীমাধব তাকিয়া ঠেসান দিয়া জাগরিত সুখস্মৃতির ও সন্ধ্যাকালের আলস্যে চক্ষু অর্দ্ধ মুদ্রিত করিয়া স্মিতমুখে কহিলেন, "সে কথায় আর কাজ কি ভাই? মজা যা হবার তা হয়ে গিয়েছে। এখন বুড়ো হয়ে পড়া যাচ্চে!"

"বিলক্ষণ, তুমি বুড়ো হলেই ত গিয়েছি! আমরা ত তা হলে আর নেই!"

"তোমরা এখনো ছেলে মানুষ। আমরা বয়সেও বড় তোমাদের চেয়ে দেখেছি শুনেছিও বেশী।"

"তা আর বল্‌তে দাদা! এখন আমাদেরও একটু দেখাও শোনাও। আমরা কি চিরকাল হাংড়িয়ে মর্‌ব?"

"দেখাতে হবে না ভাই, আপনি দেখ্‌বে। তুমি এমন ফেলাই বা যাও কি?

গোবিন্দচন্দ্র সহসা বলিলেন, "যা মনে কোরে এলাম তাই যে ভুলে যাচ্চি! বরদাদের বাড়ী যাবে না? তোমার অবশ্য নিমন্ত্রণ হয়েছে।"

"হাঁ, নিমন্ত্রণ ত হয়েছে কিন্তু আজ আর যাব না। শরীরটাও কেমন মাটী মাটী কোর্‌চে আর বাড়ীতে সব বারণ কোর্‌চে।"

"তাও কি হয় দাদা! তুমি না গেলে কিছুই আমোদ হবে না। তুমি যদি না যাও ত আমিও যাব না। নাচ গাঁওনার বন্দোবস্ত না কি বেশ ভাল হয়েচে।"

"আর ভাই তুমিও যেমন! রাঁড় ভাঁড় আর ভাল লাগে না।"

"বেশ বলেছ দাদা! বাকী রইল নামাবলী আর তুলসী মালা! কিন্তু এখন আর বেশী দেরি কোরো না, শীঘ্র এস। আমার গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে।"

"তুমি কি নিতান্তই ছাড়্‌বে না নাকি?"

"তোমায় ছাড়্‌লে আর রইল কি?"

"তবে একটু বস, কাপড় পরে আসি।"

গোবিন্দচন্দ্র সশব্যস্তে উঠিয়া প্যারীমাধবের হাত ধরিলেন, বলিলেন, "না ভাই তা হবে না। অন্দর মহলে গেলে হাতছাড়া হবে। যা পর্‌বার হয় এই খানে পর।"

প্যারীমাধব কহিলেন, "তুমি আমায় বিশ্বাস কর্‌চ না? বল্‌চি কাপড় পরে এখনি আস্‌চি।"

"তোমায় বিশ্বাস কর্‌ব না কেন, কিন্তু তোমার যে লক্ষী

সরস্বতী মাথার মণি ঘরণী গৃহিণী ব্রাহ্মণী তাঁকে বিশ্বাস নেই! বাবা, সন্ধ্যার সময় খাঁচায় ঢুক্‌লে আর উড়্‌তে পার্‌বে না। সোহাগ শিকলী বাজিবে পায় যখন তখন কি আর পালাতে পার্‌বে? সে সব হবে না দাদা, অমনি এক ছুটেই এস। নেহাত যদি লজ্জা করে ত এই নাও আমার উড়ানী।” বলিয়া গোবিন্দ চন্দ্র আপনার গলার উড়ানী প্যারীমাধবের গলায় দিলেন।

“হা৷ হাঃ হাঃ হাঃ” করিয়া প্যারীমাধব হাসিলেন। তাঁহার সঙ্গে গোবিন্দচন্দ্র যোগ দিলেন। হাসির ধমকে ঘর যেন ফাটিয়া গেল। হাসির শব্দ শুনিয়া গোটা কতক চড়ুই পাখী ভয় পাইয়া উড়িয়া গেল। হাসিতে হাসিতে প্যারীমাধবের পাঁজর ধরিয়া গেল। অনেক কষ্টে হাস্য সম্বরণ করিয়া কহিলেন, “আচ্ছা পাগলের পাল্লায় পড়েছি!” তাহার পর ভৃত্যকে ডাকিয়া কহিলেন, “কাপড় নিয়ে আয়, আর বাড়ীতে বলে আয় আমি রাত্রে বাড়ীতে থাব না।”

বরদাপ্রসাদ চৌধুরী যশোহর জেলার মস্ত জমীদার। কলিকাতায় বড় বাড়ী ভাড়া করিয়া থাকিতেন। পাড়াগাঁয়ে পড়িয়া থাকিলে কে কাহাকে চেনে?

প্যারীমাধব ও গোবিন্দচন্দ্র আসিলে চৌধুরী মহাশয় মহা সমাদরে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিলেন। চৌধুরী মহাশয়ের আকৃতি হস্তীর ন্যায়, বুদ্ধি আরও কিছু স্থূল।

নিমন্ত্রণ বেশী লোকের হয় নাই। পার্টি খুব সিলেক্ট। বাছা বাছা পাঁচ ছয় জন বন্ধুতে মিলিয়া রাত্রিটা আমোদে কাটাইবার ইচ্ছা।

প্রথম অবস্থায় বাবুরা চেয়ারে ও সোফায় উপবেশন করিলেন। রাত্রে চৌধুরী মহাশয় মাটীতে বসিয়া আহার করিতেন না। রাঁধুনী ব্রাহ্মণকে রাত্রি দুপুর পর্য্যন্ত বসাইয়া রাখিলে দোষ নাই, কিন্তু খানসামা!—ডিনর যথাসময়ে সম্পন্ন হইয়া গেল। তখন সকলেই গোলাপী রাগে রঞ্জিত।

সে সময় যে কথোপকথন হইতেছিল তাহার অধিকাংশই ইংরাজী। গ্লাস দুই পান করিলে গোবিন্দচন্দ্র আর মোটেই বাঙ্গালা বলিতে পারিতেন না। চৌধুরী মহাশয় ইংরাজিতে একেবারে———, কিন্তু ফোঁটা কতক ব্রাণ্ডি পেটে পড়িলে যে সাত পুরুষে ইংরাজি জানে না তাহারও মুখে ইংরাজি আসে!

হরিচরণ হাইকোর্টের উকীল। বয়স হইয়া আসিয়াছে কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, প্রাণটা এখনও হামাগুড়ি দেয়। তিনি একালের ছেলেদের কথা বলিতেছিলেন। ব্রাণ্ডির গুণে প্রাণ ও মুখ খুলিয়া গিয়াছিল। "হত আমাদের কালে তা হলে জল বিছুটী দিয়ে ঠিক কোরে দিত! আজ কালের বাবুরা গুরুমশায়ের কাছে ত কখন নাড়ুগোপাল হন নি!"

গোবিন্দচন্দ্র কহিলেন, "ওটা তোমার অন্যায়। ছেলে

ছোকরার কিছু দোষ কিছু গুণ থাকবারই কথা। আমরাই কি এককালে ছেলেমানুষ ছিলাম না?"

হরিচরণ স্পিরিটের মত জ্বলিয়া উঠিলেন। "আরে তুমি ত সব জান কি না! আপিসে সাহেবের মুখখানি আর বাড়ীতে কোণে বসে বই পড়া। এতে আর তুমি কি দেখ্‌বে বল? ভাগ্যিস্ প্যারীমাধব জুটে গিয়েছিল তাই যা একটু চোক কান ফুটেছে!"

প্যারীমাধব কহিলেন, "আরে তুমিও যেমন, গোবিন্দ নিজে ছেলে ছোকরার মধ্যে, ওর কথা শোন কেন?"

হরিচরণ তখন একটু ঠাণ্ডা হইয়া প্যারীমাধবের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "আমাদের সময় কি এখনকার কাণ্ড কিছু ছিল? উচ্ছন্ন যাবার এখন যে কত পথ হয়েছে তার আর সংখ্যা নেই।"

এ কথায় আর কেহ অসম্মতি প্রকাশ করিল না। চৌধুরী মহাশয় মধ্যে মধ্যে শিরশ্চালন পূর্ব্বক "ঠিক বলেছ" বলিয়া কথায় সায় দিতেছিলেন।

হরিচরণ আরও গরম হইয়া বলিতে লাগিলেন, "সোজাসুজি গোল্লায় যাবার যে পথ আছে সকলেই চেনে। কিন্তু এখন আবার নতুন রকম। কোন বেটা হেন হন কোন বেটা তেন হন। আবার কত বেটা ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে গোল্লায় যায়।"

হরিচরণ বাবুর এক ছেলের ধর্ম্মের প্রতি কিছু অনুরাগ হইয়াছিল। কেহ বলিত ব্রাহ্ম হইবে, কেহ বলিত খৃষ্টান হইবে।
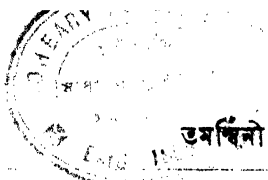
তাহা শুনিয়া জাতিভয়ে পরম হিন্দু হরিচরণ ছেলেকে ডাকিয়া অনেক রকম শাসাইয়াছিলেন, বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিবেন পর্য্যন্ত বলিয়াছিলেন। ছেলে উত্তরে একটী কথাও বলিল না, কিন্তু পিতৃবাক্যও শুনিল না, পূর্ব্বে যেমন যেখানে ইচ্ছা যাওয়া আসা করিত সেই রূপ করিতে লাগিল।

সেকালে আর একালে লাঠালাঠি কখন আর থামিল না। সেকালের লোক ভাল ছিল কি এখনকার লোক ভাল, বাপ ভাল কি ছেলে ভাল, পিতামহ ভাল কি পৌত্র ভাল সে মীমাংসা করা দুষ্কর। কিন্তু একটা বিষয়ের নির্ণয় আছে। বৃদ্ধ ও যুবকে যত স্বভাব বৈপরীত্য ততই পরস্পরের প্রতি বিরক্ত। পিতা দুর্জ্জন পুত্র সুজন, অথবা পিতা সচ্চরিত্র পুত্র অসচ্চরিত্র, এমন অবস্থায় সদ্ভাব অসম্ভব। আবার ইহাদের মধ্যে যে কুৎসা অধিক করে সেই নিশ্চিত অধিক দোষী।

অবশেষে প্যারীমাধব চৌধুরী মহাশয়কে কহিলেন, "বলি তোমার আমোদ আহ্লাদ কই?"

চৌধুরী মহাশয় অমনি উঠিলেন, বলিলেন, "যা দেরি তোমা-দের, নইলে সব প্রস্তুত।"

তখন সকলে উঠিয়া কিঞ্চিৎ স্খলিতগমনে আর এক প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। সে ঘরে ঢালা বিছানা, খুব পুরু গালিচার উপরে ধব্‌ধবে চাদর পাতা রহিয়াছে, চারিদিকে বড় বড় নরম নরম তাকিয়া। ঘরের মাঝখানে ঘোলডালওয়ালা বেলওয়ারি

ঝাড়, তাহাতে ষোলটা মোম বাতি জ্বলিতেছে। সেই শীতল শুভ্র আলোকে গৃহ আলোকিত হইয়াছে।

"আঃ বাঁচ্লাম," বলিয়া চৌধুরী মহাশয়প্রমুখ বন্ধুগণ এক এক তাকিয়ার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। বিছানার উপর রূপার মুখনল ও জুঁই ফুলের থোপ্না শুদ্ধ আলবোলার নল পড়িল। ডিকাণ্টর গ্লাস বরফ প্রভৃতিও সঙ্গে সঙ্গে আসিল।

গৃহকর্ত্তা ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওরে, সরকার এয়েচে?"

"আজ্ঞে, গাড়ী নিয়ে গিয়েছে অনেকক্ষণ, এই এলেন বলে।"

যে নর্ত্তকীকে রাত্রের জন্য বায়না দেওয়া হইয়াছিল, সরকার তাহাকেই আনিতে গিয়াছিল। বাবুরা বৈঠকখানায় বসিলে একটু পরেই সে আসিয়া উপস্থিত হইল। সর্ব্বাঙ্গ অলঙ্কারে ঢাকা, মুখে এক গাল পান। কাপড় চোপোড়ে নানা প্রকার গন্ধ সামগ্রী। ঘরে প্রবেশ করিয়া মাথার কাপড় একটু সরাইয়া, পা ঢাকা দিয়া, ফিক্ করিয়া হাসিয়া ঘরের মাঝখানে বসিল।

প্যারীমাধব অনেক ঘাটে জল খাইয়াছিলেন। নর্ত্তকীকে দেখিয়া চিনিলেন, কহিলেন, "কি গোলাপ, কেমন আছ?"

গোলাপ মর্ম্মভেদী বিলোল কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া কহিল, "এই যেমন দেখ্ছেন। আপনার ত আর দেখা পাওয়াই ভার। ক্রমে ডুমুর ফুলটী হয়ে উঠ্চেন।"

"তা নয়। ছিলাম ফুল এককালে এখন শুকিয়ে গাছতলায় পড়ে গিয়েছি। আর বয়সও হতে চল্ল।"

"আ হা হা, কথার কিবা শ্রী!" বলিয়া গোলাপ চৌধুরী মহাশয়ের প্রতি কটাক্ষপাত করিল। তিনি বলিলেন, "কি হে, আস্‌তে এত দেরি হল কেন?"

"কেন, যেই লোক ডাক্‌তে গেল অমনি ত এসেচি। দেরি আবার কোথায় হল!"

"আমরা কতক্ষণ থেকে তোমার পথ চেয়ে বসে আছি।"

"আমার কত ভাগ্য!"

গোবিন্দচন্দ্র কহিলেন, "অত দূরে বস্‌লে কেন, একটু কাছে এসে বস না।"

"কেন বেশ ত বসেচি।"

প্যারীমাধব বাবু সটকার নল হাতে করিয়া মুখনল গোলাপের মুখের কাছে ধরিয়া কহিলেন, "এটা একবার প্রসাদ কোরে দাও।"

গোলাপ হাসিয়া নল হাতে লইল। কহিল, "বলুন না কেন আপনাদের প্রসাদ পাই।"

গোবিন্দচন্দ্র একটু পরে কহিলেন, "এখন একটা গাও।"

"কি গায়িব বলুন?"

"কিন্তু বাজাইবে কে?" চৌধুরী মহাশয়ের সহজেই স্থূল, তাহাতে সুরাপানে জড়িত, বুদ্ধিতে বিষম সংশয় উপস্থিত হইল।

প্যারীমাধব কহিলেন, "হরিচরণ থাক্‌তে আবার জিজ্ঞাসা কর্‌তে হয়?"

"তাও ত বটে।"

বাঁয়া তবলা আসিলে হরিচরণ হাতুড়ি দিয়া খানিক ক্ষণ ঠুক্ ঠাক্ করিয়া যন্ত্র বাঁধিয়া লইলেন। তার পর দুই চারিবার চাটি দিয়া গোলাপকে কহিলেন, "ধর।"

গোলাপ মৃদু মৃদু হাসিয়া কহিল, "কি গায়িব ?"

প্যারীমাধব ডিকাণ্টর ও গ্লাস তাড়াতাড়ি তাহার সম্মুখে ধরিয়া কহিলেন, "বাঃ শুধুমুখে গায়িতে পার্‌বে কেন ? এক গ্লাস খেয়ে গাও।"

গোলাপ হাত নাড়িয়া অস্বীকার করিল, কহিল, "না, আপনারা খান, আমি আর খাব না।"

"তাও কি কখন হয়! গায়িতে এখনি গলা শুকিয়ে যাবে। একটু খানি খাও।"

সকলের পীড়াপীড়িতে অবশেষে গোলাপ এক গ্লাস পান করিল। পরে প্রকোষ্ঠ ধ্বনিত করিয়া গাহিতে লাগিল। সঙ্গীতে মোহিত হইয়া শ্রোতাগণ কিছু ঘন ঘন গ্লাস নিঃশেষ করিতে লাগিলেন।

ফরমায়েশ হইল, "নাচের সঙ্গে হউক।"

তখন উঠিয়া নর্ত্তকী নাচিতে লাগিল। বাইজীর ধরণে নাচ, হস্ত ও অঙ্গভঙ্গী করিয়া তবলায় তালে তালে নাচিতে লাগিল। তাহার শরীরে যেন লালসার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ উঠিতে লাগিল, যেন প্রতি পদক্ষেপে চারিদিকে তরল বিদ্যুৎ ছড়াইয়া পড়িতে

লাগিল। চৌধুরী মহাশয় গোবিন্দচন্দ্রকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "গোলাপ একটা না দুটো? আমি দেখ্‌চি দুটো।"

"তবে বাবা তোমার এখনো চোকের দোষ আছে। আমি দেখ্‌চি গোলাপময় ত্রিভুবন!"

নাচিতে নাচিতে গোলাপ তাহার সাড়ীর আঁচ্‌লা প্যারীমাধবের মুখের উপর ফেলিয়া টানিয়া লইল। আঁচলার জরিতে প্যারীমাধবের মুখে যেন কণ্টক বিদ্ধ হইল। তিনি কহিলেন, "মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা কেন?"

হরিচরণ এক জন বিখ্যাত বাজিয়ে, কিন্তু অতিরিক্ত সুরাপানে মাথার ও হাতের কিছুরই ঠিক ছিল না। নৃত্য ছাড়িয়া গোলাপ যখন আবার গীত ধরিল তখন হরিচরণের একবার তালভঙ্গ হইল। গোলাপ তৎক্ষণাৎ গানবন্ধ করিয়া ভ্রূভঙ্গ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ও কি?" হরিচরণের চমক ভাঙ্গিল। গুরুমহাশয়ের কাছে কানমলা খাইলে বালক যেমন অপ্রতিভ হয়, সেই মত অপ্রতিভ হইয়া হরিচরণ আপনার দোষ স্বীকার করিলেন। গোলাপ আবার গাহিতে আরম্ভ করিল।

কিছুক্ষণ পরে হরিচরণ আবার তাল ঠিক রাখিতে পারিলেন না। গোলাপ গান বন্ধ করিয়া আর এক গ্লাস ব্রাণ্ডি পান করিল। হরিচরণ দুই চারিবার তাহাকে গান করিতে অনুরোধ করিয়া ক্ষান্ত হইলেন।

গোবিন্দচন্দ্র কোন ভাবে মুগ্ধ হইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিয়া-

ছিলেন। যেমন করিয়া মাতালে কাঁদে সেইরূপ কাঁদিতেছিলেন। প্যারীমাধব অপেক্ষাকৃত প্রকৃতিস্থ ছিলেন, কহিলেন, "ভাবে যে তেলাকুচো রে!"

সহসা মাতালের ভাবান্তর উপস্থিত হইল। গোবিন্দচন্দ্রের স্বদেশবাৎসল্য সহসা উথলিয়া উঠিল। চক্ষু মুছিয়া গোলাপকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া জড়িত স্বরে কহিলেন, "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী!"

গোলাপেরও আদব কায়দা ব্রাণ্ডির তেজে অন্তর্হিত হইতেছিল। গোবিন্দচন্দ্রের রকম দেখিয়া ও তাহার কথা শুনিয়া কহিল, "মর্ মিন্সে বলে কি! এই সময় বুঝি ওঁর জননীকে মনে পড়্ল!"

শয়িতাবস্থায় গোবিন্দচন্দ্র দেখিলেন বিছানার আর একদিকে চৌধুরী মহাশয় অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া আছেন। তাঁহার নাসিকাগর্জ্জন বৃংহিতের ন্যায় শ্রুত হইতেছে।

সেই নিদ্রিত কুম্ভকর্ণমূর্ত্তি দেখিয়া গোবিন্দচন্দ্র ক্ষুদ্র নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "The fittest survive!" বলিয়া স্বয়ং পাশ ফিরিয়া শয়ন করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

আইবুড়ো মেয়েকে বিবাহের কথা বলিলেই সে লজ্জা পাথেকো বিবাহে যে অসম্মতি তাহা নয়। এক রত্তি মেয়ে বিবাহ কাঁদাহের চাহিলে তাহাকে বেহায়া, ঠোঁটকাটা আরও কতকগুলি বুলের নাম লাভ করিতে হয়। তাহার মনে যাহা থাকে দুই চারিটি সমবয়সীকে বলে। আর উপরে বিবাহের কথা শুনিলে হয়-রাগিয়া উঠে নহিলে পলাইয়া যায়।

স্বর্ণময়ীর বিবাহে অনিচ্ছাও সকলে সেই রকম মনে করিত। স্বর্ণ নিজের মন নিজেই জানিত না। সে এখনও ছেলে মানুষ, যে বয়সে মানুষ নিজের মন স্থির করিয়া জানিতে পারে, তাহার সে বয়স হয় নাই। সে নিজের মনে এইটুকু কেবল ঠিক জানিত যে, বিবাহে তাহার বাস্তবিকই অনিচ্ছা, কপট নয়। কেন এমন অদ্ভুত মনের ভাব তাহা সে নিজেই বলিতে পারিত না। সে কোন কারণ স্থির করিতে পারিত না।

কারণ অবশ্য ছিল। অবিবাহিতা কন্যা বিবাহ করিতে চাহে না, এরূপ অসম্ভব কথা বিনা কারণে সম্ভবপর হইতে পারে না। কারণ অবশ্য ছিল, কেবল স্বর্ণ—ছেলে মানুষ—নিজে কিছু স্থির করিতে পারিত না।

ছিলেন। ...রত যে তাহার জীবন যেরূপে কাটিতেছিল, সেই প্যারীমাধ... সে সুখে থাকিবে। বিবাহ হইলে যে পরিবর্ত্তন ত্রৈলোক্য...া তাহার মনে লাগিত না। মাতাকে ছাড়িতে, ...ার সকলকে ছাড়িতে তাহার মন সরিত না। নাই বা হইল?

...কিন্তু এ কারণ ত সকল কুমারীর মনেই হইতে পারে। স্বর্ণর আরও একটা কারণ ছিল। সেই কারণ ক্রমে বলবৎ হইয়া ...তেছিল।

হেমন্তকুমার নামক একজন স্বজাতীয় যুবক বাড়ীতে যাতায়াত করিত। দূর সম্বন্ধে জ্ঞাতি, চারুবালার মাতুলালয়ের নিকট-নিবাস। সেই জন্য বাড়ীর গৃহিণী তাহাকে একটু আদর অপেক্ষা করিতেন। হেমন্তকুমারের পিতৃমাতৃবিয়োগ হইয়াছিল, বাড়ীতে আর কেহ ছিল না, কেবল এক বৃদ্ধা ঠান্‌দিদি। সেই জন্য হেমন্তকুমারকে সকলে একটু দয়া করিত।

মৃত্যুকালে হেমন্তকুমারের পিতা কিছু কোম্পানির কাগজ রাখিয়া গিয়াছিলেন। সুদ যাহা আসিত তাহাতে একজন গৃহস্থের খরচ বেশ সচ্ছলতার সহিত সম্পন্ন হয়। হেমন্তকুমার একা, পরিবারের মধ্যে ঠান্‌দিদি। সুতরাং সুদের টাকাও সমস্ত ব্যয় হইত না।

হেমন্তকুমারের বয়ঃক্রম বিশ বৎসর। সকলে তাহাকে ভাল ছেলে বলিত। আর এক বৎসর হইলেই তাহার অধ্যয়ন শেষ হয়।

ছেলেটী ভাল দেখিয়া একবার স্বর্ণময়ীর মা মনে করিয়াছিলেন যে, এমন জামাতা হইলে মেয়ের সৌভাগ্য। কিন্তু সে কথা একবার পাড়িতেই প্যারীমাধব ও তাঁহার গৃহিণী উড়াইয়া দিয়াছিলেন। প্যারীমাধবের আপত্তি, ছেলেটী বড়মানুষের ঘরের নয়। গৃহস্থ হইলে কি হয়? গৃহিণীর আপত্তি, বাপমাখেকো ছেলে। এই কথা শুনিয়া বিধবা বড় ভয় পাইয়াছিলেন। বিবাহের কথা সকলেই ভুলিয়া গিয়াছিল। হেমন্তকুমার বাড়ীর ছেলের মত বাড়ীতে আসিত যাইত এই পর্য্যন্ত।

স্বর্ণময়ীর বাল্যজীবনে, আগতপ্রায় কৈশোরের পথে হেমন্তকুমারের ছায়া পতিত হইয়াছিল!

ইহারা দুইজন এ পর্য্যন্ত আত্মমনোভাব বুঝিতে পারে নাই। স্বর্ণময়ী বালিকা, হেমন্তকুমার অধ্যয়নে মগ্ন, একত্রে বাস অথবা সর্ব্বদা দেখা সাক্ষাৎও ঘটিত না। প্রণয়ের সঞ্চার এমন অবস্থায় ঘটিবার কথা নয়। দুইজনেই জানিত তাহাদের বিবাহ হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব প্রণয়ের কল্পনা পর্য্যন্ত তাহাদের পক্ষে দূষণীয় ও নিষ্ফল।

তাহারা প্রণয়ের কল্পনা করিত না। স্বর্ণময়ী প্রণয় কি তাহা জানিত না, হেমন্তকুমারও মনে করিত এ রকম ভালবাসা প্রেম নয়। দুইজনে ছেলেমানুষের মত কথা কহিত, কখন হেমন্তকুমার অধ্যয়নলব্ধ কোন আশ্চর্য্য কথা স্বর্ণময়ীকে বলিত, বালিকা অবাক্ হইয়া শুনিত। হেমন্তকুমার যখন তাহাদের

বাড়ীতে আসিত তখন সকলের সঙ্গে দেখা করিবে মনে করিয়াই আসিত। কিন্তু যদি কখন স্বর্ণময়ীর সঙ্গে দেখা না হইত, তাহা হইলে সে দিন নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যাইত।

ক্রমে দর্শনলালসা বাড়িতে লাগিল। দেখা না হইলে যেন একটা কিসের অভাব, দেখা হইলে যেন দিনটা ভাল যাইত। কথাবার্ত্তায় কোনই পরিবর্ত্তন হয় নাই। যখন স্বর্ণময়ীর বিবাহের কথা হইতে লাগিল, তখন তাহার মনে একটা অজানিত আশঙ্কার উদয় হইতে লাগিল। কেন ভয়, কিসের ভয় প্রথমে বুঝিতেই পারে না। তাহার পর বুঝিল যে বিবাহ হইলে হেমন্তকুমারের সঙ্গে আর দেখা হইবে না। সেই ভয়।

মনের মুকুল তখন ক্রমে ক্রমে প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল।

প্রণয়সঞ্চারের বয়সের কিছু নিরূপণ নাই। যে বালক বালিকা আজ ভাই ভগিনীর মত খেলা করিতেছে, কাল তাহারাই পরস্পরের প্রেমে আবদ্ধ হইতে পারে। যুবক ও যুবতী পরস্পরের নিকট থাকিলে সহজেই তাহাদের চিত্ত পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়। বাল্যপ্রণয় আর এক রকম। তাহাতে আসক্তির লেশ মাত্র নাই। এই কারণে যুবক যুবতীর প্রেম অপেক্ষা বালক বালিকার প্রেম দীর্ঘস্থায়ী।

যে সময় স্বর্ণময়ীর বিবাহের সম্বন্ধ হইতেছিল ও সে অন্যান্য বালিকার ন্যায় বিবাহে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেছিল, তখন একদিন বাড়ীর সকলে কোন্নগরে বেড়াইতে গিয়াছিল। কোন্নগরে

প্যারীমাধবের শ্বশুরালয়। সেখানে এক রাত্রি থাকিয়া দ্বিতীয় দিবস সকলের কলিকাতায় ফিরিয়া আসিবার কথা।

হেমন্তকুমারের ঠান্‌দিদি কোন্নগরে থাকিতেন, সে কলিকাতায় বাসা করিয়া থাকিত। মধ্যে মধ্যে বাড়ী যাইত। আজ সেও কোন্নগরে গিয়াছিল।

প্যারীমাধবের শ্বশুরবাড়ী ও হেমন্তকুমারের বাড়ী বড় বেশী দূর নয়। ঠান্‌দিদির সঙ্গে দেখা করিয়া ও তাঁহার প্রস্তুত জলখাবার খাইয়া হেমন্তকুমার প্যারীমাধবের শ্বশুরালয়ে গেল।

সময়টা বৈকাল বেলা। হেমন্তকুমার একবার বাড়ীর ভিতর গিয়া আবার বাহিরে আসিল। যাহাকে দেখিবার ইচ্ছা তাহাকে দেখিতে পাইল না। কোথায় গিয়াছে কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিল না, কিন্তু বুঝিতে পারিল সে বাড়ীতে নাই। হয়ত পাড়ায় বেড়াইতে গিয়াছে।

বাড়ীর বাহিরে কিছু দূরে একটী পুষ্করিণী। চারিদিকে প্রকাণ্ড বাগান। নারিকেল, তাল, খেজুর, আম, কাঁঠাল, লিচু, জামরুল, সকলই আছে। একদিকে সারি বাঁধা সুপারি গাছ। অযত্নে চারিদিকে বন হইয়াছে। পুষ্করিণীর নিকটে নানা জাতি ফুল গাছ, গাছের তলায় রাশি রাশি শুষ্ক ফুল পড়িয়া রহিয়াছে। বাঁধান ঘাট, তাহার কোন কোন স্থানে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। পুষ্করিণীর নিকটে বাগানের মধ্যে রায়েদের বাড়ীর ছেলেপুলে হুড়াহুড়ি করিয়া গাছের ফল পাড়িতেছিল ও লুকাচুরী খেলা করিতেছিল।

পুষ্করিণীর এক ধারে একটা চাঁপা গাছ। ডালপালা চারিদিকে ঝুলিয়া অন্ধকার করিয়া রহিয়াছে। ফুলে গাছ ভরিয়া পড়িয়াছে। গাছের তলায় একটা কাঁঠাল গাছের আধখানা গুঁড়ি পড়িয়া রহিয়াছে। তাহার উপর একা বসিয়া স্বর্ণময়ী। আর সকলে খেলায় মত্ত, সে কেবল একলাটী চুপ করিয়া বসিয়া, পুষ্করিণীর দিকে চাহিয়া ভাবিতেছিল। তাহার আবার কিসের ভাবনা?

কোথা হইতে হেমন্তকুমার সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। স্বর্ণময়ী আপনার ভাবনায় মগ্ন ছিল, কিম্বা পদশব্দ শুনিয়া মনে করিল, তাহার খেলার সঙ্গী কেহ আসিতেছে। সে ফিরিয়া চাহিল না। হেমন্তকুমার আসিয়া নিঃশব্দে তাহার পিছনে দাঁড়াইল। পায়ের কাছে একটা চাঁপা ফুল পড়িয়াছিল, সেইটা তুলিয়া লইল। স্বর্ণময়ী তখনও ফিরিয়া চাহিল না, কিন্তু কে তাহার পিছনে দাঁড়াইয়াছে তাহা বুঝিতে পারিল।

হেমন্তকুমার মৃদুস্বরে ডাকিল, "স্বর্ণ!"

স্বর্ণময়ী কোন উত্তর দিল না, ফিরিয়া হেমন্তকুমারের মুখের দিকে চাহিল।

ইতিপূর্ব্বে দেখা হইলে তাহারা হাসিয়া কথা কহিত, গাম্ভীর্য্য কেমন তাহা জানিত না। আজ এই পুষ্করিণী তীরে, নিভৃত উপবন মধ্যে, সায়াহ্ন সূর্য্যের সম্মুখে তাহাদের ভাবান্তর উপস্থিত হইল। যে স্বর্ণ বালিকাস্বভাবসুলভ চপলতাবশতঃ অনর্গল কথা

কহিত, তাহার মুখে কথা ফুটিল না। হাস্যমুখ হেমন্তকুমার আজ গম্ভীর হইয়া তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিল।

স্বর্ণময়ী কথা কহিল না, কেবল একদৃষ্টে হেমন্তকুমারের মুখের পানে চাহিয়া রহিল। কতক্ষণ পরে হেমন্তকুমার বলিল, "স্বর্ণ, তোমার বিয়ে হবে?"

অন্য সময় হইলে, আর কেহ হইলে স্বর্ণময়ী রাগ করিত। এখন সে পূর্ব্বের মত নিরুত্তর রহিল। কেবল বিস্ফারিত কোমল নয়নযুগল অশ্রুতে ভরিয়া আসিল।

সেই সজলনয়ন করুণামূর্ত্তি দেখিয়া হেমন্তকুমারের চক্ষে জল আসিল। তখন, বিনা বাক্যে উভয়ের অধর মিলিত হইল। কুসুমস্পর্শের ন্যায় একটী মাত্র চুম্বন। তাহার পর দুইজনে মুখ ফিরাইল। স্বর্ণময়ীর গণ্ড বহিয়া দুই ফোঁটা অশ্রু পতিত হইল। হেমন্তকুমার চক্ষের জলে কিছু দেখিতে পাইতেছিল না।

সেই ঈষৎ চুম্বনস্পর্শে সমস্ত কথা হইল। স্বর্ণময়ীর জীবনপদ্ম প্রস্ফুটিত হইল। তখন সে দেখিল, হেমন্তকুমার তাহার সূর্য্য। প্রণয়ের প্রথম চুম্বন! জীবন যৌবনের প্রথম বিকাশ, আকাঙ্ক্ষার প্রথম উদ্বোধন!

সে চুম্বন সুখের নহে। উভয়ের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ, উভয়ের হৃদয়ে অসীম যন্ত্রণা। দুঃখজলধি মন্থন করিয়া সেই চুম্বন-কুসুম স্বরূপ অমৃত-হলাহল উঠিল। দুইজনে বুঝিতেছিল যে সেই চুম্বন চির-মিলনের চিহ্ন নহে, চিরবিচ্ছেদের নিদর্শন। শান্তিময় নির্জ্জনের

মধ্যে, শীতল বাপীতটে, মধুর সায়ংকালে উভয়ে সেই চুম্বন দ্বারা প্রণয়ের প্রতিদান ও বিনিময় স্বরূপ পরস্পরকে অনন্ত দুঃখ প্রদান করিল!

স্বর্ণময়ী যখন সেখানে আসিয়া বসিয়াছিল, তখন সে বালিকা। যখন উঠিল, তখন তাহার বাল্যকাল অতীত হইয়াছে! একটী মাত্র চুম্বনে তাহার শৈশব লুপ্ত হইল!

দুই জনে একটু বসিয়া রহিল। স্বর্ণ আগে উঠিল, কহিল, "বাড়ী যাই। সন্ধে হচ্চে।"

হেমন্তকুমার কহিল, "আমি তোমার সঙ্গে যাব?"

অন্য দিন হইলে স্বর্ণময়ীর মনে কোন সঙ্কোচ হইত না। আজ সে সঙ্কুচিত হইল, কহিল, "না, আমি একাই যাই। বাগানে ছেলেরা আছে, তাদের সঙ্গে যাব।"

হেমন্তকুমার আবার বলিল, "পুকুরের ওধার পর্য্যন্ত যাব?"

স্বর্ণময়ী কোন আপত্তি করিল না, কোন কথাই কহিল না। হেমন্তকুমার তাহার সঙ্গে চলিল। দুই জনের ছায়া অস্তগামী সূর্য্যকিরণে দীর্ঘ হইয়া পুষ্করিণীর জলে পড়িল। স্বর্ণময়ী সেই ছায়া দেখিতে লাগিল। পরে বলিল, "পুকুরে ত কত লোক ডুবে মরে। আমি মরি না কেন?"

হেমন্তকুমার চমকিত হইয়া তাহার হাত ধরিল, কহিল, "সে কি? কেন স্বর্ণ, অমন কথা কেন?"

তখন স্বর্ণ মুখ তুলিয়া অগাধ প্রেমভরে, অগাধ দুঃখভরে

হেমন্তকুমারের মুখের প্রতি চাহিল। কহিল, "কোন্ সুখে বেঁচে থাকা? আমি মর্‌লে কার ক্ষতি?"

হেমন্তকুমারের স্বর বাষ্পরুদ্ধ হইল, কোমল স্বরে কহিল, "ছি! ও কথা মনে কোর্‌তে নেই। আমাদের কপালে যদি দুঃখ থাকে ত দুঃখই ভোগ কর্‌ব। কিন্তু আশা চিরকালই থাক্‌বে!"

হায় বাল্যকাল! হায় যৌবন! হায় সংসার! স্বর্ণময়ীর মুকুলিত জীবনে, নবীন বসন্তাগমে মনের প্রথম সাধ—সরোবরের শীতল জলতলে শয়ন!

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

হিন্দুর পরিবার, বাঙ্গালীর পরিবার, বিধবা নহিলে সম্পূর্ণ হয় না। প্যারীমাধবের এত বড় পরিবার যে বিধবাশূন্য হইবে তিনি এমন কিছু পুণ্য করেন নাই। তাঁহার পরিবারে যে কয়জন বিধবা ছিলেন তাঁহাদিগের মধ্যে এই গ্রন্থে কেবল দুই জনের উল্লেখ আবশ্যক।

প্রথম, পিসি। ইনি প্যারীমাধবের পিসী, এই কারণে বাড়ী সুদ্ধ লোকের পিসি। দাস দাসীরা পর্য্যন্ত সেই সম্বন্ধ ধরিত। তবে তাহারা ও বাড়ীর কতক লোকে পিসিমা বলিয়া ডাকিত, অবশিষ্ট সকলে সংক্ষেপে পিসি বলিত। পিসিমা সেকেলে লোক, বয়স কয় গণ্ডা তাহার ঠিক হিসাব ছিল না, কিন্তু গঙ্গা-স্নানে ও বৈধব্যের আশীর্ব্বাদে এ পর্য্যন্ত বেশ শক্ত সমর্থ ছিলেন।

দ্বিতীয়, শ্যামা। ইনি প্যারীমাধবের ভ্রাতুষ্পুত্রী। ইঁহাকে সকলে নাম ধরিয়া সম্পর্ক হিসাবে ডাকিত। ইনি তরুণী, সুন্দরী। যুবতীদের রঙ্গরসের কথায় ইঁহার যেমন মন গঙ্গাস্নানে বা ঠাকুরদেবতার কথায় তেমন মন ছিল না। ঠাকুর ঘরের যে টুকু কাজ বিধবা বলিয়া করিতে হয় সেই টুকু করিতেন, মন থাকিত অন্য দিকে।

পিসিমা কোন কালে সুন্দরী ছিলেন না, হয়ত সেই জন্য সুন্দরীদিগের উপর তাঁহার একটু স্বাভাবিক বিদ্বেষ ছিল। বিবাহের পর তাঁহার দুই তিনটী সন্তান হইয়াছিল। সে গুলিকে ও স্বামীকে খাইয়া এখন নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়াছিলেন, সুতরাং মমতা নামে যে একটা হৃদয়ের দুর্ব্বলতা সেটা তাঁহার বড় একটা ছিল না।

শ্যামা বাল্যবিধবা, বিবাহের রাত্রি ব্যতীত কখন স্বামীর মুখাবলোকন করে নাই। সে কথাও তাহার ভাল মনে ছিল না, কারণ বিবাহকালে সে নিতান্ত বালিকা। এখন বয়স প্রায় পঁচিশ বৎসর। পূর্ণ যৌবন বিফলে বহিয়া যাইতেছিল। শ্যামার সঙ্গে মুক্তকেশীর, চারুবালার বড় ভাব। শ্যামা বয়সে বড় হইলেও সকলের অপেক্ষা অনভিজ্ঞ, ও সেই জন্য অত্যন্ত আগ্রহের সহিত আর সকলের কথা শুনিত। গান করিতে, গোপনীয় কথা বলিতে শ্যামা সকলের সেরা হইয়া উঠিয়াছিল। যে সব গান অতি কদর্য্য, যে সকল গল্প নিতান্ত অশ্রাব্য সেই সকল গান ও গল্প বয়স্যাদিগের নিকট করিত। ইহা ভিন্ন অন্য কিছু আমোদ সে জানিত না। নিন্দা করিতে বাড়ীতে শ্যামার তুল্য পিসিমা ছাড়া আর কেহ ছিল না।

সেকালে আর একালে যে চিরন্তন বিরোধ তাহা বিধবাদিগের মধ্যে সমধিক প্রবল। সেই নিয়মানুসারে পিসিমা ও শ্যামা পরস্পরের ঘোর বিদ্বেষী, সম্পর্কের কেহই কোন ধার ধারিতেন

না। তবে মুখামুখী বড় একটা কেঁদেল বাধিত না। উভয়ের অসাক্ষাতে উভয়ে বিষবাণ নিক্ষেপ করিতেন।

শ্যামা সুন্দরী। শরীরে সৌন্দর্য্য ফুটিয়া, টুটিয়া পড়িতেছিল। সে যখন একা থাকিত তখন আপনার শরীর আপনি নিরীক্ষণ করিত। মুকুরে আপনার মুখ দেখিত। তাহার সেই কৃষ্ণতার প্রশস্ত নয়নযুগলের অলস কটাক্ষ, ফুল্ল লোহিত সরস ওষ্ঠাধর, কঠোর বৈধব্য জীবনের অনুপযোগী। যৌবনের অটুট রূপরাশি এক মাত্র শুভ্র বসনে আচ্ছাদিত হইত না। মুক্তর সহিত শ্যামার বিশেষ প্রণয়। সুবিধা পাইলেই শ্যামা মধ্যাহ্নের সময় পাশের বাড়ীতে যাইত। মুক্ত ও তাহাতে মিলিয়া উপরে বসিয়া গল্প করিত। মুক্ত কতবার তাহার রূপের সুখ্যাতি করিত, এমন রূপযৌবন বৃথা গেল বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিত। এবং সহানুভূতির চিহ্নস্বরূপ নিজের সুখের কথা শ্যামাকে শুনাইত। শুনিতে শুনিতে শ্যামার শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিত। চক্ষু আর্দ্র হইত, ঘন ঘন নিশ্বাস বহিত। কোন কোন সময় দুই জনে খাটে শুইয়া গল্প করিত। শ্যামা একটী একটী করিয়া সমস্ত কথা মুক্ত:ক জিজ্ঞাসা করিত। মুক্ত সমস্ত বলিত। শ্যামা বাড়ীতে আসিয়া সেইসব ভাবিত, ও মনে মনে কপালের নিন্দা করিত। কত রাত্রে তাহার চক্ষে নিদ্রা আসিত না, শয্যায় শয়ন করিয়া উন্মীলিত চক্ষে ভাবিত আর সকলেই বা এত সুখী কেন, তাহার অদৃষ্টেই বা কোন সুখ নাই কেন? মনে করিত রাত্রে চারি-

দিকে কত সুখের স্বপ্ন, কত সুখের কথা, কত সোহাগ, কত প্রণয়—কেবল তাহাকেই সমস্ত জীবন এইরূপ করিয়া কাটাইতে হইবে। এইরূপ ভাবিয়া ভাবিয়া শ্যামার মন আরও কঠোর হইল। অন্যের সুখে সে আরও কাতর হইতে লাগিল, অন্যের নিন্দা তাহার পক্ষে আরও প্রিয় বোধ হইতে লাগিল। শৈশব-কালে সে লেখাপড়া শিখে নাই, ধর্ম্ম কর্ম্ম লোকমুখে ব্যতীত সে আর কোথাও শুনে নাই। স্বার্থত্যাগ কাহাকে বলে সে জানিত না। সুতরাং বৈধব্য যে সমাজের পক্ষে মঙ্গলকর ও পবিত্র নিষ্কাম ধর্ম্মাচরণের পথ তাহাও সে জানিত না।

পিসিমার যৌবনের জ্বালা ছিল না। তিনি বয়স বিগুণে সে দায় হইতে উদ্ধার হইয়াছিলেন। কিন্তু যেমন নিজে কঠোর ঘোর শুদ্ধাচারিণী ছিলেন পরের সে বিষয়ে কিছুমাত্র ত্রুটী তাঁহার তেমনি অসহ্য বোধ হইত। শ্যামার রকম সকম তিনি দু চক্ষের বিষ দেখিতেন। কোন পুরুষ কোন স্ত্রীলোকের সঙ্গে কিছু অধিক ক্ষণ কথা কহিলেই তাঁহার মনে সন্দেহ হইত। তিনি স্নান, পূজা, ও রন্ধনকালে কাহাকেও স্পর্শ করিতেন না, কিন্তু তাঁহার মন সর্ব্বক্ষণই সকলকে স্পর্শ করিত। তাঁহার কথায় বোধ হইত যে পৃথিবীতে যে টুকু পুণ্য আছে, তাঁহার শরীরে, আর কোথাও পুণ্য নাই। আর সকলেই পাপাসক্ত, সকলেই কলুষ-চিত্ত, সকলেরই মন পাপের দিকে। পিসিমা সেই চিন্তায় ব্যাকুল থাকিতেন। অমুকের সঙ্গে অমুক নষ্ট, অমুক ছোঁড়া অমুক

ছুঁড়ীর সঙ্গে হাসিয়া কথা কয়, অমুকের বউ বিষ খাইয়া মরিয়াছে, পিসিমার মুখে কেবল এই কথা। ভাতের হাঁড়িতে কাঠি দিতে দিতে এই কথা, গঙ্গাস্নানের পথে অন্য বুড়ীদের সহিত সেই কথা, হরিনামের মালা হাতে নাম জপিতে জপিতে সেই কথা।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

রজনীকান্তের পাঠ্যাবস্থায় রমানাথ নামে এক সহপাঠী ছিল। রমানাথ দরিদ্রসন্তান। বয়সে রজনীকান্তের অপেক্ষা দুই চারি বৎসরের বড়। রজনীকান্ত যখন স্কুল হইতে বিদায় গ্রহণ করে তাহার এক বৎসর পূর্ব্বেই রমানাথ স্কুল ছাড়িয়া গিয়াছিল। বিদ্যালয়ের প্রতি তাহার আস্থা ছিল না, বাড়ীতে বিদ্যাভ্যাস করিবে বন্ধুদিগকে এইরূপ জানাইত। রজনীকান্তের সহিত রমানাথের আলাপ বিদ্যালয়ে যেমন ছিল, পরেও সেইরূপ রহিল। পূর্ব্বে যেমন নিত্য সাক্ষাৎ হইত এখন তেমন হইত না, কিন্তু মাঝে মাঝে দেখা হইত। দীনবন্ধু বাবুর ভয়ে রমানাথ রজনীকান্তের গৃহে বড় একটা আসিত না। হয় রজনীকান্ত তাহাদের বাড়ী যাইত, অথবা পথে তাহাদের সাক্ষাৎ হইত।

রজনীকান্ত জানিত রমানাথ অসাধারণ বুদ্ধিমান। রজনীকান্ত স্বয়ং বড় বুদ্ধিমান নয়। ইহাদের বন্ধুত্ব দিন দিন বাড়িতেছিল। রমানাথ নিজের বিষয় নানা রকম কথা রজনীকান্তকে বলিত। সেই সব কথা শুনিয়া ও রমানাথের প্রখর বুদ্ধি দেখিয়া রজনীকান্ত স্থির করিয়াছিল যে তাহার বন্ধু এক দিন বড় লোক হইবে। বলা বাহুল্য, সে বিশ্বাস রমানাথের নিজেরও ছিল।

রমানাথ দেখিতে সুপুরুষ। গোলগাল, নাদুস্‌নুদুস্ গৌর মূর্ত্তি, গোঁফের একটু রেখা দিয়াছে। দাড়ি পরিষ্কার করিয়া কামান। মাথায় টেরি সর্ব্বদা ঠিক থাকে, একগাছি চুল এদিক ওদিক হইলেই মুস্কিল। দরিদ্র হইলেও বেশভূষার বিলক্ষণ পারিপাট্য। কোঁচান দেশী ধুতি, কলপ দেওয়া জামা, সরু পাড়-ওয়ালা কোঁচান চাদর, পায়ে বার্ণিশ করা জুতা নহিলে রমানাথ পথে বাহির হয় না। কোথা হইতে এ সব আসে সেই জানে।

রমানাথ সর্ব্বঘটে আছেন। গাহিতে বাজাইতে গল্প করিতে গুড়ুক ফুঁকিতে তাহার মত আর একটী মেলা ভার। কথাবার্ত্তার চটকে চমক লাগে। পলিটিক্স্, সাহিত্য, সমাজোন্নতি, ধর্ম্মসংস্কার সকল বিষয়েই তাহার দখল আছে। তর্কের স্রোতে পড়িলে আর রক্ষা নাই। এমন চৌকস, তীব্রবুদ্ধি লোক সংসারে প্রায় ঠকে না।

এক দিন বৈকালে রজনীকান্ত বাড়ীতে বসিয়া আছে এমন সময় রমানাথ নটবর মোহন বেশে ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে আসিয়া উপস্থিত। রজনীকান্ত কিঞ্চিৎ ভীত, কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া কহিল, "তবু ভাল, বাবা আজ বাড়ী নেই, কাজে গিয়েছেন।"

কথাটা রমানাথ ফুঁ দিয়া উড়াইয়া দিল। কহিল, "তুমি কি চিরকাল ছেলেমানুষের মত থাকবে? বাবা ত আর বাঘ নয় যে দেখ্‌লেই খেয়ে ফেল্‌বে।"

রজনীকান্ত কিছু অপ্রস্তুত হইয়া কহিল, "তা নয়, তবে

কেমন একটা অভ্যাস। তোমায় দেখে কি বাবা কিছু বল্‌বেন! তবু কি জানি যদি রাগ করেন।”

“তোমার কি কোন কালে দুজন বন্ধু হতে নেই, কথা কবার দুটো মানুষ হতে নেই?”

রজনীকান্ত আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিল, “আমিও ত তাই ভাবি। তুমি এলে বাবা বোধ হয় আর রাগ কোর্‌বেন না।”

“তোমার ত বাবা নয়, জুজু। জুজুর ভয় যত দিন না ভাঙ্‌বে ততদিন তুমি আর মানুষ হবে না।”

উত্তর খুঁজিয়া না পাইয়া রজনীকান্ত হাসিতে লাগিল। রমানাথ বলিল, “চল, এখন একটু বেড়াতে যাওয়া যাক্‌।”

“যদি পথে বাবার সঙ্গে দেখা হয়?”

“তা হলে হাঁ কোরে তোমায় আস্ত গিল্‌বে।” বলিয়া রমানাথ নিজে হাঁ করিয়া বিকট মুখভঙ্গী করিল।

রজনীকান্ত এতটুকু হইয়া গেল। কহিল, “না না, সে জন্য নয়। যে মেঘ কোর্‌চে, এখনি হয়ত বৃষ্টি হবে। তাই ভাব্‌চি আজ আর বেরিয়ে কাজ নেই।”

“তুমি বাড়ীতে দিব্য বসে থাক আর আমি বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে যাই। তোমার নইলে এমন বুদ্ধি আর কার যোগাবে!”

এ কথাটা রজনীকান্ত মোটেই ভাবে নাই। রমানাথকে যাইতে বলাও ভাল দেখায় না, থাকিতে ত কোন মতেই বলা

যায় না। দুইদিক ভাবিয়া রজনীকান্ত বেড়াইতে যাওয়াই স্থির করিল, ও তাড়াতাড়ি কাপড় পরিয়া রমানাথের সঙ্গে বাহির হইয়া পড়িল।

এদিকে আকাশ বেশ অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে। বায়ু মন্দ বহিতেছে, মেঘ ক্রমাগতই চারিদিক হইতে জমিতেছে। কালো আকাশের তলে দীনবন্ধু বাবুর বৃহৎ শ্বেতবর্ণ বাড়ী আরও সাদা দেখাইতেছে। আকাশে যত চিল উড়িতেছিল তাহারা আরও উপরে উঠিতে লাগিল। কাকগুলা নীচে নামিয়া আসিতে লাগিল। দুইজনে বৃষ্টি মাথায় করিয়া ভ্রমণ করিতে চলিল।

রজনীকান্ত জিজ্ঞাসা করিল, "কোন দিকে যাবে?"

"গঙ্গার ধারে।"

"সে যে অনেক দূর। সেখানে বৃষ্টি এলেই বা আমরা যাব কোথায়?"

"তবে চল আর কোন দিকে যাই।"

রমানাথ সহরের গলি ঘুঁজি সমস্ত চিনিত। কিছু দূর এদিক ওদিক করিয়া রজনীকান্তকে একটা নূতন পথে লইয়া গেল। দেখিতে দেখিতে বৃষ্টি আসিল। রজনীকান্ত তখন মনে করিল এইবার তাহার জিত। বলিল, "আমি ত তখনি বলেছিলাম!"

"কি বলেছিলে?"

"বৃষ্টি হবে।"

"তবে ত তুমি মস্ত লোক। বৃষ্টি হবে কে না জান্‌ত?"

"তবে এই দুর্যোগে বেড়াতে আসা কেন?"

"বৃষ্টিতে কি লোক পথ চলে না?"

এতক্ষণ বৃষ্টি টিপ্‌ টিপ্‌ করিয়া পড়িতেছিল। এখন চাপিয়া আসিল। রমানাথ দৌড়িয়া একটা গৃহের দরজা ঠেলিল। দ্বার খোলা ছিল। রমানাথ দ্বারের ভিতর দাঁড়াইল। রজনীকান্ত তাহার পাশে আসিয়া সভয়ে মৃদুস্বরে কহিল, "কার বাড়ীতে ঢুক্‌লে? এখনি হয়ত তাড়িয়ে দেবে।"

রমানাথ হাস্যমুখে কহিল, "তাড়িয়ে দেয় কি কি করে এখনি দেখা যাবে।"

একটু দাঁড়াইয়া রমানাথ একবার গলার শব্দ করিল। অমনি দোতালার বারান্দা হইতে প্রশ্ন হইল, "কে গা?"

রজনীকান্ত কহিল, "মেয়ে মানুষের গলা যে! বাড়ীতে বুঝি পুরুষ মানুষ নেই। চল ভাই আমরা বাহিরে যাই।"

"মেয়েমানুষও তোমায় খেয়ে ফেল্‌বে না কি? মেয়েমানুষও বাবা না কি?"

রজনীকান্ত উত্তর দিবার পূর্ব্বেই মেয়েমানুষ নিজে গোটা-কতক সিঁড়ী নামিয়া আসিল। রমানাথকে দেখিয়া কহিল, "রমানাথ! পোড়া দশা! আমি বলি বুঝি পথের মানুষ কেউ! তা দরজাগোড়ায় দাঁড়িয়ে কেন, উপরে এস না!"

সর্ব্বনাশ! মেয়েমানুষ ত বাস্তবিকই মেয়েমানুষ! বেচারি

রজনীকান্ত আজ পর্য্যন্ত বেশ্যালয়ের চৌকাট পর্য্যন্ত মাড়ায় নাই, এখন সম্মুখে দেখিল বেশ্যা, বাড়ীও বেশ্যার! তাহার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। মূঢ়ের মত রমানাথের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। বাহিরে মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছিল।

রমানাথ স্ত্রীলোকের প্রতি যে কটাক্ষ ইঙ্গিত নিক্ষেপ করিল রজনীকান্ত তাহা দেখিতে পাইল না। রমণীর কথা শুনিয়া রমানাথ রজনীকান্তকে কহিল, “চল না উপরে গিয়ে একটু বসি। বৃষ্টি ধর্‌লে বাড়ী যাব।”

রজনীকান্ত মহা ভয় পাইয়া কহিল, “না, আমি এই খানে বেশ আছি।”

রমানাথ তাহার কানে কানে কহিল, “মেয়েমানুষ তোমার বাবার বাবা! একটু বস্‌লে কি তোমার জাতিপাত হবে?”

রমণী অত্যন্ত মধুর স্বরে কহিল, “আপনারা একটু উপরে এসে বসুন না। তাতে ত কোন ক্ষতি নেই। বৃষ্টি থাম্‌লে যাবেন।”

রমানাথের সঙ্গে যখন প্রথম কথা কহিয়াছিল তখন রমণীর স্বর অন্য রকম। রজনীকান্ত বুঝিতে পারিল, এ কথাটা তাহাকে লক্ষ্য করিয়া রমণী বলিল।

পলক মাত্র রজনীকান্ত মাথা তুলিয়া আবার চক্ষু নত করিল। কিন্তু সেই পলকে দেখিতে পাইল রমণী সুন্দরী এবং তাহার দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে।

রমানাথ রজনীকান্তের হাত ধরিল, বলিল, "উপরে এস না। এখনি আমরা আবার চলে যাব।"

রজনীকান্ত ফাঁপরে পড়িল। বলপ্রকাশ করা ভাল দেখায় না, স্ত্রীলোকটা দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল। উপরে উঠিতেও সম্পূর্ণ অনিচ্ছা। এদিকে রমানাথ হাত ধরিয়া টানিতেছিল। অবশেষে নিরুপায় দেখিয়া রজনীকান্ত উপরে উঠিল।

উপরে একটা ছোট রকম ঘরে দিব্য পরিষ্কার ঢালা বিছানা, দেয়ালে চারিদিকে কদর্য্য ছবি। রজনীকান্ত বন্ধুর পীড়াপীড়িতে অত্যন্ত সঙ্কোচের সহিত বিছানার এক ধারে উপবেশন করিল। একটু পরে সেই রমণী বাটায় করিয়া পান আনিয়া রজনীকান্তের সম্মুখে ধরিল। কহিল, "একটা পান খান না।"

রজনীকান্ত রমানাথের দিকে চাহিয়া কহিল, "না, আমি পান খাব না।"

রমণী হাসিয়া কহিল, "আপনি ভয় পাচ্চেন কেন? বাড়ীর পান নয়, বাজারের সাজা পান।"

রমানাথ কহিল, "তুমি ত আচ্ছা পাগল হে! পান খেতেও দোষ না কি?" বলিয়া নিজে দুইটা পান খাইল, আর দুইটা জোর করিয়া রজনীকান্তের মুখে পুরিয়া দিল। মুখ হইতে সে আর ফেলিয়া দিতে পারিল না।

তার পর রমণী বাঁধা হুকায় জল ফিরাইয়া তামাকু সাজিয়া আনিল। রজনীকান্ত নূতন তামাকু ধরিয়াছে, কিন্তু এখন কিছু-

তেই খাইতে সম্মত হইল না। রমণী বলিল, "এ হুঁকায় না খান বলুন অন্য হুঁকা এনে দি। ব্রাহ্মণের হুঁকো দেবো ?"

কিন্তু তামাকু রজনীকান্ত কিছুতেই খাইল না। রমানাথ কহিল, "আতর, না খায় ত সাধাসাধির আবশ্যক কি ? আমায় দাও।" হুঁকা লইয়া রমানাথ নিশ্চিন্ত ভাবে টানিতে লাগিল।

আতর রজনীকান্তের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল, কিন্তু যাহাতে রজনী-কান্তের সহিত চোখোচোখী না হয় এই ভাবে দাঁড়াইয়াছিল। রজনীকান্ত আড়ে আড়ে দুই চারিবার তাহার প্রতি না চাহিয়া থাকিতে পারিল না। আতরের বক্ষে সূক্ষ্ম বস্ত্রের একটা কাঁচলি ছিল, তাহাতে বক্ষঃস্থল ব্যক্ত ব্যতীত লুক্কায়িত হইতেছিল না। পরিধানে চওড়া কালাপেড়ে পাতলা সাড়ী, সুতরাং তাহার শরীরের অধিকাংশই অনাচ্ছাদিত ছিল। পায়ে টক্‌টকে চ্যাটালো আল্‌তা পরা। বয়স অনুমান সপ্তদশ বৎসর। কেশ নিবিড়, কৃষ্ণগুচ্ছ, কানের পাশে জুল্‌পি কাটা। চক্ষু চঞ্চল, দীর্ঘ, আলস্যআবেশময়, বিদ্যুদ্বর্ষি, উন্মাদকারী। ওষ্ঠাধর ঈষৎ স্থূল, রক্তবর্ণ, মধুময়। দেহ সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ। প্রতি কটাক্ষে রজনীকান্ত এই রূপের এক এক অংশ দেখিতে পাইল।

বৃষ্টি ক্রমে থামিয়া আসিল। রমানাথ একবার উঠিয়া বাহিরে গেল। আতরও বারান্দায় দাঁড়াইয়াছিল। ফিরিবার সময় রমানাথ তাহাকে অতি মৃদুস্বরে কহিল, "একটু সাবধানে ! একেবারে নতুন ! ভড়্‌কায় না যেন !"

আতর কোন উত্তর দিল না, কেবল একবার কটাক্ষপাত করিল। কটাক্ষের অর্থ, "আমায় কিছু বলিতে হইবে না, আমি সমস্ত বুঝিয়াছি।"

রমানাথ ফিরিয়া আসিলে রজনীকান্ত তাড়াতাড়ি উঠিয়া কহিল, "এখন বৃষ্টি থেমেছে, চল বাড়ী যাই।" উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া জুতা পরিতে লাগিল।

আর পীড়াপীড়ি করা উচিত নয় বিবেচনা করিয়া রমানাথও গমন করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিল। রজনীকান্তকে কহিল, "বৃষ্টি থেকে রক্ষা পেলে সে জন্য ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। কি বল, আতর!"

আতর কহিল, "আপনারা আমার বাড়ীতে এসে দাঁড়িয়েছেন এই আমার কত ভাগ্য!"

রমানাথ রজনীকান্তকে আবার কহিল, "সেকৃষ্যাণ্ড কোর্‌বে না?"

আতর নিজেই আসিয়া রজনীকান্তের হাত ধরিল, বলিল, "আর কি কখন আস্‌বেন না?" তাহার স্বরের কাতরতা ও কোমলতায় পাষাণও গলিয়া যায়।

রজনীকান্ত ঘামিতে লাগিল। চোরের মত কহিল, "এ পথে আমি কখন আসি না।"

"যদি কখন পথ ভুলে আসেন তা হলে কি একবার এ বাড়ীতে ঢুক্‌বেন না?" বলিয়া রজনীকান্তের হাত টিপিল।

রজনীকান্ত একেবারে বাক্‌শূন্য। হাত ছাড়াইয়া কিরূপে

নিষ্কৃতি পাইবে তাহার কেবল সেই চেষ্টা। আতর আরও তাহার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার নিশ্বাস রজনীকান্তের মুখ স্পর্শ করিতে লাগিল। তাহার পর আর দুই তিন বার রজনীকান্তের হাত টিপিয়া আতর তাহাকে ছাড়িয়া দিল। মুক্তি পাইয়া রজনীকান্ত একেবারে সিঁড়ীর নীচে আসিয়া দাঁড়াইল। রমানাথ আতরের সহিত ইংরাজি কায়দায় দস্তুর মত সেক্‌হাণ্ড করিয়া ধীরে ধীরে নীচে নামিল।

পথে বাহির হইয়া রমানাথ আতরের প্রশংসায় প্রবৃত্ত হইল। রূপ গুণের ত কথাই নাই, তাহার চরিত্রও যে বেশ্যার মত নয় রমানাথ তাহার বিস্তর প্রমাণ দেখাইল। তাহার সহিত মাঝে মাঝে দেখা সাক্ষাৎ করিলে দোষ কি ?

যে পর্য্যন্ত পথ চিনিত না সে পর্য্যন্ত রজনীকান্ত নীরবে চলিল। প্রতি মুহূর্ত্তে তাহার ভয় হইতেছিল যদি পিতার সহিত সাক্ষাৎ হয়! যখন সে পথ চিনিতে পারিল তখন তাহার রাগ হইল। রাগের মাথায় রমানাথকে অনেক কটু কথা বলিল। অবশেষে বলিল, "আর আমি কখন তোমার সঙ্গে কোথাও যাব না। তোমার সঙ্গে দেখাও করতে চাই না।" এই বলিয়া রমানাথের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া রজনীকান্ত বেগে গৃহাভিমুখে চলিয়া গেল।

গালি খাইয়া রমানাথ মৃদু মৃদু হাস্য করিতে করিতে ও গুন্ গুন্ করিয়া থিয়েটরের গান করিতে করিতে বাড়ী গেল।

নবম পরিচ্ছেদ।

স্বর্ণময়ীর বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইতে কিছু বিলম্ব হইল বটে কিন্তু অবশেষে তাহার বিবাহ হইল। কলিকাতা হইতে কিছু দূরে এক গ্রামে সম্বন্ধ স্থির হইল। এখন তাহাদের সহরেই বাস। পূর্ব্বে তাহারা ধনী ছিল, এখনও বেশ গৃহস্থ। প্যারী-মাধব যেমন মনে করিয়াছিলেন তেমন বর মিলিল না, কিন্তু মেয়ে যেরূপ বড় হইয়াছিল আর তাহাকে ঘরে রাখা ভাল দেখায় না। বিবাহের সময় পাত্র কেমন সে বিচার কেহ করিল না। পাত্রের বাপ মা কেমন তাহাই সকলে জানিতে চায়। শ্বশুর ঘর লইয়াই মেয়ের সুখ দুঃখ, যাহার সহিত বিবাহ তাহার সম্বন্ধে কিছু জানিবার তেমন প্রয়োজন ছিল না।

বিবাহের দিন স্বর্ণময়ীর পক্ষে যেন স্বপ্নের মত গেল। কেন বিবাহ, কাহার সহিত বিবাহ? তাহার ত বিবাহে কিছুমাত্র ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু তাহাকে কেহ ত কিছুই জিজ্ঞাসা করিল না। মনের কথা মনের মধ্যে মরিয়া রহিল। সে বুঝিয়াছিল তাহার মনের কথা লজ্জার কথা, লুকাইবার কথা। গুমরিয়া গুমরিয়া সেই কথা বুকের ভিতর পুড়িতে লাগিল। আর কোন উপায় নাই, কেবল রোদন, তাহাও নীরবে। সারাদিন সে মনের কথা মনে

নিয়া কাঁদিল। কত লোকে কত বুঝাইল, মাতা নিজে কাঁদিয়া কত সান্ত্বনা করিলেন, কিন্তু প্রকৃত কথা কেহই জানিল না। সব কথা স্বর্ণ বুঝিতে পারিল না। সে এই টুকু বুঝিল যে তাহার একটা ভয়ানক বিপদ উপস্থিত হইয়াছে। জীবনের পথে যেন সহসা অন্ধকার অতলস্পর্শ গহ্বর দেখিল। সেই গহ্বরের সম্মুখে বসিয়া সে সেই অতল অন্ধকার দেখিতে লাগিল। আর কিছু দেখিতে পায় না, আর কিছু বুঝিতে পারে না। কেবল ভয় সেই অন্ধকারে পতিত হইবে। আলোকময়, বিহঙ্গকাকলীপূর্ণ, হাস্যগীতময় বাল্যজীবন সেই বিকটান্ধকারে ডুবিয়া যাইতে লাগিল। কোথায় সে সরল, সুখপূর্ণ, হাস্যক্রীড়াময়ী বালিকা! কোথায় সে ক্ষুদ্র সুখদুঃখপরিপূর্ণ প্রভাত জগৎ! সে সমস্ত কথা এখন বিস্মৃত হইল। মনে পড়িল কেবল সেই শৈবালসঙ্কুল পুষ্করিণী, পুষ্পিত চম্পক বৃক্ষ, সুরভিবাহী ধীর সায়াহ্ন সমীরণ; নিবিড় শাখাপত্রভেদী সূর্য্যকিরণ, আন্দোলিত ছায়া, কদাচিৎ বিহঙ্গরব; সেই অমৃতময় পরিচিত মৃদু কণ্ঠস্বর, সংক্ষিপ্ত সুমধুর সম্ভাষণ, সেই বাষ্পবিকলিত মধুর যন্ত্রণাময় দৃষ্টি! আর সেই মল্লিকাকুসুমতুল্য মৃদুস্পর্শ চুম্বন, সুখসুপ্ত জীবনের প্রথম জাগরণ, দেহে প্রথম প্রেমস্পর্শ, জীবনামৃতের প্রথম আস্বাদন, অধরে অধরে প্রথম বৈদ্যুত বিনিময়, প্রাণপ্রবাহের প্রথম তরঙ্গ। সেই চুম্বনের চিহ্ন অধরে রহিল না কেন? যে স্পর্শ তপ্তলৌহচিহ্ন অপেক্ষা দীর্ঘস্থায়ী, যে স্পর্শে সর্ব্বাঙ্গ এ পর্য্যন্ত শিহরিতেছিল,

যে স্পর্শে হৃদয় প্রাণ চিহ্নিত হইয়াছিল, বাহিরে তাহার কোন চিহ্ন রহিল না কেন? তাহা হইলে আর এ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত না। তাহার মুখে সে চিহ্ন দেখিয়া সকলেই জিজ্ঞাসা করিত, কিসের চিহ্ন। তখন স্বর্ণময়ী সকলকে বলিতে পারিত যাহার চিহ্ন সেই তাহার দেহের ও জীবনের প্রভু। তখন সে মুক্ত-কণ্ঠে বলিতে পারিত যে অপরের সহিত তাহার বিবাহ হওয়া পাপ। যে তাহাকে প্রথম প্রণয় চুম্বন দ্বারা চিহ্নিত করিয়াছিল সেই তাহার স্বামী। কিন্তু এখন কেমন করিয়া বলিবে? মর্ম্মে মর্ম্মে যে চিহ্ন ক্রমাগতই গভীরতর অঙ্কিত হইতেছিল বাহ্যিক তাহার ত কোন নিদর্শন ছিল না! তবে সে কথা কেমন করিয়া বলা যায়? বিবাহের রাত্রে স্বর্ণ বুঝিল একটা কথা তাহার গোপন করিবার আছে। বুঝিল, সে কথা গোপন করা যায়, কিন্তু বিস্মৃত হওয়া যায় না।

বিবাহের পর দিবস যখন বর কন্যার বিদায় হইবার সময় হইল তখন স্বর্ণময়ী মাতাকে এমনি করিয়া জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল যে দুই জন লোক মিলিয়া তাহাকে ছাড়াইতে পারে না। অবশেষে জোর করিয়া তাহাকে পাল্কীর ভিতর পূরিল। পিসিমা তাহার বাড়াবাড়ি দেখিয়া রাগিয়া উঠিলেন। রাগের ঝোঁকটা পড়িল স্বর্ণর মার উপর। "আদর দিয়ে দিয়ে একেবারে মেয়েটার মাথা খেয়ে দিয়েছে তার আর কি হবে! অত বড় মেয়ে শ্বশুর বাড়ী যেতে কি অমনি কোরে কাঁদে?

আজ বাদে কাল ছেলে কোলে কোরে শ্বশুর বাড়ী থেকে আস্‌বে, ওর কি এখন কাঁদ্‌বার বয়স? শ্বশুর বাড়ী ঐ রকম কোর্‌লে সুখ্যাতি রাখ্‌বার আর জায়গা থাক্‌বে না!”

স্বর্ণময়ীর মা পূর্ব্বেই কাঁদিতেছিলেন, ভৎর্সিত হইয়া আরও কাঁদিতে লাগিলেন।

শ্যামা স্বর্ণকে দেখিয়া নিজের বিবাহের কথা মনে করিতে-ছিল। যে সুখে সে বঞ্চিত, হয়ত স্বর্ণ নিজ সৌভাগ্যবলে সেই সুখ ভোগ করিবে। সে স্বর্ণর পাশে গিয়া হাসিয়া হাসিয়া কহিল, “ওরে এখন যেতে কাঁদ্‌চিস, দুদিন পরে আস্‌তে কাঁদ্‌বি। আমাদের জন্য যে টুকু পারিস্ এই বেলা কেঁদে নে, এর পর কি আর আমাদের ফেলে যেতে এমন কান্না আস্‌বে!”

স্বর্ণময়ী কাঁদিতে কাঁদিতে গেল। শ্বশুরালয়ে গিয়া ভয়ে তাহার কান্না থামিয়া গেল। এক সপ্তাহ কাল তাহার পক্ষে কারাবাস ও কুস্বপ্নের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। যখন ফিরিয়া আসিল তখন একবার তাহার মনে অত্যন্ত আহ্লাদ হইল। সমস্ত স্বপ্নের মত বোধ হইতে লাগিল। বিবাহ মিথ্যা, শ্বশুরবাড়ী মিথ্যা। সে যেমন চিরদিন মাতার কাছে ছিল তেমনি থাকিবে। যখন হাতে লোহা ও মাথায় সিন্দূর দেখিত তখন তাহার ভ্রম ভাঙ্গিয়া যাইত। সধবার লক্ষণ? কে তাহাকে সধবা সাজাইতে বলিয়া-ছিল? সধবা সাজিবার জন্য তাহার কি ভাবনা ছিল? তাহার যে নিজের কোন অপরাধ ছিল এমন তাহার মনে হইত না। দোষ

তাহার কপালের, আর, যাহারা তাহার বিবাহ দিয়াছিল তাহাদের।

ফিরিয়া আসিয়া স্বর্ণময়ী আগের মত খেলাধূলা করিয়া বেড়াইতে লাগিল। যে বয়সে প্রেম সমস্ত শরীর মন অধিকার করে তাহার এ পর্য্যন্ত সে বয়স হয় নাই। আকাশে মেঘ ও ঝটিকার মত কখন তাহার মনে বিষাদ ছাইয়া আসিত আবার অন্তরাকাশ নির্ম্মল হইত। হেমন্তকুমার যেমন আসিত যাইত সেইরূপ আসিতে যাইতে লাগিল। পূর্ব্বের মত তাহারা কথাবার্ত্তা কহিত, কেবল সেই পুষ্করিণীতীরের কথা কখন হইত না। অথচ যখন দুই-জনের সাক্ষাৎ হইত সেই কথাই সর্ব্বাগ্রে স্মরণ হইত। স্বর্ণময়ী মনে করিত এইরূপই তাহাদের চিরকাল যাইবে। দেখা সাক্ষাৎ হইলেই সে এখন সন্তুষ্ট, মনে করিত এরূপ দেখা সাক্ষাতে কখন কোন বিঘ্ন ঘটিবে না। ভবিষ্যতের ভাবনা কিছুতেই তাহার মনে আসিত না।

হেমন্তকুমারের মনে আশঙ্কা হইতে লাগিল। স্বর্ণময়ী যাহা ভাবিত না সে তাহা ভাবিত। সে বুঝিল তাহাদের অন্তরে যে অনুরাগ জন্মিয়াছে এরূপ দেখা সাক্ষাৎ হইলে তাহা বর্দ্ধিত বই হ্রাস হইবে না। কিন্তু সে বাড়ীতে যাতায়াত বন্ধ করিতেও তাহার প্রবৃত্তি হয় না। লোকে কি বলিবে? আবার মনও বোঝে না। যেখানে প্রণয় সেখানে বিবেক কি করে? স্বর্ণময়ী ত দুদিন পরে শ্বশুরবাড়ী চলিয়া যাইবেই। তখন ত তাহাদের

সাক্ষাৎ বিরল হইবে। এ কয়টা দিন মধ্যে মধ্যে দেখা হইলে ক্ষতি কি? আর যখন তাহাদের দেখা হইত তখন ত দূষণীয় কথা কিছুই হইত না!

এইরূপে দুই জনে আত্মপ্রতারিত হইতে লাগিল। বুদ্ধি সর্ব্বদা প্রবৃত্তির অনুগামিনী। হৃদয়ের গতি যে দিকে, বিবেকেরও গতি সেই দিকে। যে কার্য্য প্রথমে গর্হিত বোধ হয়, সেই কার্য্যই যুক্তিবলে অবশেষে নির্দ্দোষ প্রতিপাদিত হয়। যাহা প্রথমে অকর্ত্তব্য মনে হয় তৎপ্রতি চিত্ত আকৃষ্ট হইলে তাহাকেই ক্রমে দোষশূন্য বলিয়া প্রতীতি জন্মে। স্বর্ণময়ী যথার্থ বলিতে গেলে আত্মপ্রতারিত হয় নাই, কেন না এ পর্য্যন্ত তাহার চিত্তের স্থিরতা হয় নাই, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের সম্পূর্ণ জ্ঞান হয় নাই, হৃদয়ের সহিত মনের বিরোধ উপস্থিত হয় নাই। দুইজনে এই প্রভেদ। দুইজনকে একই স্রোতে টানিয়া ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছিল। হেমন্তকুমার স্রোতের বিপরীতে যাইবার চেষ্টা করিত, স্বর্ণময়ী নিশ্চিন্তভাবে গা ভাসান দিয়া স্রোতের সঙ্গে বহিয়া যাইতেছিল। কোথায় যাইতেছে কেহই জানিত না। হেমন্তকুমারের মাঝে মাঝে ভয় হইত, মনে হইত প্রবলবেগে বহিয়া সমুদ্রের অভিমুখে যাইতেছে, অবশেষে সেই সমুদ্রে ডুবিতে হইবে। স্বর্ণময়ীর সে ভয় কখন হইত না। জ্যোৎস্নাময়ী তটিনীতে সে বহিয়া যাইতেছিল, চারিদিকে অস্ফুট কলকল স্বপ্নময় মধুর তরঙ্গভঙ্গ, তীরে কুসুম-কানন। সে আর কিছু দেখিতে পাইত না। ক্ষণকালের জন্য

যদি সে জ্যোৎস্নালোক মেঘাচ্ছন্ন হইত, আবার তখনি সমস্ত পরিষ্কার হইয়া যাইত।

অদৃষ্ট বলিতে হয় বল, কপাল বল, ভবিতব্যতা বল, এই স্রোত চিরকাল এইরূপ বহিতেছে। সেই স্রোতে কেহ ইচ্ছা-পূর্ব্বক কেহ অনিচ্ছাপূর্ব্বক ভাসিয়া যায়। অপ্রতিহত প্রবাহের বিরুদ্ধে কেহ দাঁড়াইতে পারে না। স্বর্ণময়ী ও হেমন্তকুমার ভাসিয়া কোথায় যাইতেছিল, কে জানে?

দশম পরিচ্ছেদ।

"হ্যাঁ ভাই, সেই গানটী কর্ না।"

"না ভাই, অন্ধকার হয়ে এল, চল্ নীচে যাই। এখনি সবাই বক্‌তে আরম্ভ কর্‌বে।"

"তা করুক্। আমার সেটী শেখ্‌বার বড় ইচ্ছে হয়েছে। আর জানিস্ ত ভাই অন্য দিন এমন সময় আমার আস্‌বার যো নেই।"

"না ভাই কাজ নেই, আর এক দিন হবে। যে বাড়ী, হেসে একটী কথা কবার যো নেই। রাত্রি দিন ভয়ে ভয়ে থাকৃতে হয়।"

"একটা দিন বই ত নয়, না হয় দুটো কথাই শুন্‌বি। এতবার বল্‌চি একটা কথা কি শুন্‌তে নেই? আমার মাথা খাস্, সেই গান্‌টী গা।"

প্যারীমাধবের বাড়ীর ছাদে বসিয়া মুক্ত শ্যামাকে গান করিতে অনুরোধ করিতেছিল। পাশে চারুবালা, স্বর্ণ, আরও দুই চারি জন বাড়ীর মেয়ে বসিয়াছিল। সন্ধ্যা হইয়াছে। অন্ধকার হইয়া আসিতেছিল।

অনুরোধে পড়িয়া শ্যামা গান ধরিল। যেমন গান ধরিয়াছে

অমনি ছাদের অপর পার্শ্ব হইতে কে বলিল, "ভর সন্ধে বেলা ছাতে বসে টপ্পা গাওয়া হচ্চে! কলির সন্ধে এই বটে। আমাদের কালে ভদ্র লোকের মেয়ে ছেলে হলে গলায় দড়ি দিয়ে মর্‌ত।"

সে শুষ্ক, কর্কশ, তীক্ষ্ণ স্বর পিসিমার গলা ছাড়া আর কাহারও গলা হইতে বাহির হইত না। সেই শব্দ বাহির হইবা মাত্র গান বন্ধ হইয়া গেল। হরিনামের ঝুলি হস্তে বিড়্ বিড়্ করিয়া মালা জপিতে জপিতে পিসিমা অগ্রসর হইলেন। যুবতীদিগের সম্মুখে আসিয়া কহিলেন, "আমিও ত তাই বলি শ্যামা নইলে এমন সময় এখানে কে! তা, হ্যাঁলা, সোমত্ত ছুঁড়ীদের সঙ্গে তোর কি গান করা ভাল দেখায়? গাইতে হয় ঠাকুরুণ বিষয় কি গান নেই?"

পিসিমার কথার ধার যেমন বাঁধুনিও তেমনি। অন্য সময় আবল তাবল এমন কত কথা বকেন, কত আল্‌গা কথা বলিয়া ফেলেন, কিন্তু যখন কাহাকেও দুইটা কথা শুনাইতে হয় তখন বেশ গুছাইয়া লইয়া বলেন, যাহাতে একটী কথাও বৃথা না যায়, সব কথা গুলি একটী একটী করিয়া মর্ম্মে লাগে। এমনতর বড় একটা ঘটিত না। দুইজনে হয় পরোক্ষে নয় শব্দভেদী বাণ দ্বারা আপন আপন রণতৎপরতা প্রদর্শন করিতেন। আজ সম্মুখ সংগ্রামে পিসিমা সাহস করিয়া অগ্রসর হইলেন। তাহার কারণ শ্যামাসুন্দরী কিছু বেশী বাড়াবাড়ি করিতে আরম্ভ

করিয়াছিলেন। এবং মুক্তকেশী ও আর আর সকলের সম্মুখে শ্যামাকে দুইটা কথা শুনাইবার লোভ পিসিমা সম্বরণ করিতে পারিলেন না।

শ্যামাও স্বভাবতঃ একটু মুখচোরা; অর্থাৎ প্রকাশ্যে কোন কথা সহজে বলিত না। গোপনেই তাহার সব করা অভ্যাস। রসের কথা গোপনে, নিন্দার কথা গোপনে, সুখদুঃখের সব কথা চুপি চুপি। মুখফোঁড় হইবার তাহার অবকাশ হয় নাই। বাল্যকাল হইতেই তাহাকে সব লুকাইতে হইত। যখন তাহার রাগ হইত তখন সে কুটুস্ করিয়া কামড়াইয়া সরিয়া যাইত। যাহাকে কামড়াইত সে জ্বলিয়া মরিত কিন্তু কিসে কামড়াইল, কেমন করিয়া কামড়াইল, ভাল বুঝিতে পারিত না। ক্রোধের সে নিশ্বাস, সে গর্জ্জন, সে অঙ্গভঙ্গী, শ্যামা সমস্ত দমন করিয়াছিল। অন্তরের সেই হলাহল উদ্গীরণ, সেই টুকু ছিল।

কিন্তু এখন এত লোকের সাক্ষাতে চুপ করিয়া থাকা অপমান ও পরাজয়। শ্যামা তাই একটু হাসিয়া, নিরীহ ভাল মানুষের মত কহিল, "পিসিমা, সন্ধে বেলা ছাতে উঠেছ? নাবতে গিয়ে অন্ধকারে সিঁড়ী না দেখ্‌তে পেয়ে পড়ে যাবে!"

এই পিসিমা মহা খাপা হইয়া উঠিলেন। "কেন লা, আমি কি চক্ষের মাথা খেয়েচি না কি? তুমি তাই মানাও বটে, তা হলে আর তোমার গুণ দেখ্‌বার কেউ থাকে না। তা আমি কি এত বুড়ো হয়েচি যে আমায় কাণা বল্‌লি?"

"বালাই, তুমি কাণা হতে গেলে কেন? বলি, পিসিমা, ছাতে এসে অবধি কবার হরি নাম হলো?"

পিসিমা তেলে বেগুণে জ্বলিয়া উঠিলেন। রাগের মাথায় কথার আর কোন ঠিক রহিল না, যাহা মুখে আসিল শ্যামাকে তাহাই বলিলেন।

শ্যামা দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিল, "আজ পিসিমার অনেকবার হরি নাম হয়েছে। কাল আর গঙ্গা নাইতে গিয়ে কাজ নেই।" এই খোঁচা দিয়া শ্যামা নীচে চলিয়া গেল। তাহার সঙ্গিনীগণও তাহার সঙ্গে গেল। পিসিমা নীচে আসিয়া কাঁদিয়া বাড়ী মাথায় করিলেন।

এই রকম অসুবিধায় বাড়ীতে শ্যামা সাহস করিয়া একটু আমোদ আহ্লাদ করিতে পাইত না। নিন্দা করিবার, নিন্দা শুনিবার লোক অনেক জুটিত কিন্তু দুটা গান কিম্বা দুটা হাসি তামাসার কথা বলিবার লোক মিলিত না। শ্যামা তাই প্রায় পাশের বাড়ীতে মুক্তর কাছে যাইত। সেখানে দুইজনে দরজায় খিল দিয়া গলা মিলাইয়া গান করিত, গল্প করিত, যাহা ইচ্ছা তাহাই করিত। পিসিমা সে পর্য্যন্ত পৌছিয়া উঠিতে পারিতেন না।

মুক্তর বাড়ীতে সম্প্রতি তাহার ভাই বৈকুণ্ঠ আসিয়াছিল। বৈকুণ্ঠের বয়স বছর পনর ষোল, অজ পাড়াগেঁয়ে, কলিকাতায় পড়িবার জন্য আসিয়াছিল। সম্বন্ধীর সর্ব্বত্রই আদর। বৈকুণ্ঠ মহা সমাদরে ভগিনীপতির বাড়ীতে রহিল। কিছুদিন

আসিয়া সে কলিকাতার রাস্তায় রাস্তায় হাঁ করিয়া বেড়াইত। তাহাকে দেখিয়া শ্যামার প্রথমে একটু লজ্জা হইল, সে বাড়ী থাকিতে আসিতে চাহিত না। শেষে মুক্ত একদিন তাহাকে বলিল, "শ্যামা, অত বাড়াবাড়ি কিছু নয়। ঐ এক রত্তি বৈকুণ্ঠ, দুধের ছেলে, ওকে আবার লজ্জা! কেন, আমার ছোট ভাই কি তোর ছোট ভাই নয়?"

সেই অবধি দুধের ছেলে বৈকুণ্ঠকে ছোট ভাইটী মনে করিয়া শ্যামা আর তাহাকে লজ্জা করিত না। পাড়াগেঁয়ে হইলেও বৈকুণ্ঠের একটা গুণ ছিল—সে বেশ গাহিতে পারিত। কৈশোরের প্রারম্ভেই যেমন ছেলেদের গলা ভাঙ্গিয়া একটু কর্কশ হয় বৈকুণ্ঠের সে রকম হয় নাই। বড় মিষ্ট গলা, ও যাহা শুনিত তৎক্ষণাৎ তাহাই শিখিতে পারিত। সেই জন্য শ্যামার কাছে তাহার শীঘ্রই আদর বাড়িল। মুক্ত ও শ্যামা দুইজনে বসিয়া কতদিন দুপুর বেলা বৈকুণ্ঠকে গান করাইত, কতদিন তাহাকে পয়সা দিয়া থিয়েটরে গান শিখিবার জন্য পাঠাইয়া দিত। থিয়েটরে গিয়া বৈকুণ্ঠ গান শিখিত, আরও কিছু শিখিত। বিদ্যালয়ে লেখাপড়া যত হউক আর না হউক অন্যদিকে তাহার শিক্ষা রীতিমত হইতে লাগিল। পাড়াগেঁয়ে বলিয়া তাহার যে কলঙ্ক তাহা শীঘ্রই ঘুচিতে লাগিল।

কিন্তু মুক্তর কাছে ও শ্যামার কাছে বৈকুণ্ঠ দুধের ছেলেই রহিল। তাহাদের কাছে তেমনি আবদার করিত, তেমনি

থিয়েটরের গান, থিয়েটরের কথা বলিত, তাহাদের হাসি তামাসার কথা শুনিত, তাহাদের গায়ে পড়িত। দুপুর বেলা তাহার স্কুলে থাকিবার কথা, কোন দিন জলখাবারের সময় আসিত, কোন দিন ছুটি লইয়া আসিত, কোন দিন পলাইয়া আসিত। মুক্তর চেয়ে শ্যামার কাছেই তাহার আবদার বেশী। নিজের দিদির চেয়ে পাতান দিদির কাছে আদর বেশী হইবারই কথা। উভয়ের অজ্ঞাতে ক্রমে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন ঘটিতে লাগিল। যে কথা বৈকুণ্ঠ মুক্তর কাছে প্রথমে বলিতে লজ্জা করিত শ্যামার কাছে বলিতে তেমন লজ্জা করিত না। যে গানটা তাহার ভাল লাগিত সেটা শ্যামাকে প্রথমে শুনাইলে তাহার আহ্লাদ হইত। শ্যামা অত খুঁটিনাটি লক্ষ্য করিত না। সে কোন পরিবর্ত্তন বুঝিতে পারিত না। তবে এক এক দিন যখন বৈকুণ্ঠ আদর আবদারের কিছু বাড়াবাড়ি করিত, বড় গায়ে পড়িত, তখন শ্যামার একটু মনে ভয় হইত, মনে হইত যে সে বৈকুণ্ঠকে যত ছেলেমানুষ মনে করে সে তত ছেলেমানুষ নয়। তখন সে একটু সরিয়া গিয়া, একটু হাসিয়া, একটু বিরক্তির সহিত কহিত, "আঃ ব্যস্ত করিস্ কেন? তুই ত নেহাত ছেলেমানুষটী নোস্।"

বৈকুণ্ঠও তখন লজ্জিত হইয়া সরিয়া বসিত।

এক একবার শ্যামার সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠিত, বুঝিতে পারিত যে মুক্তর স্পর্শে ও এই কিশোরবয়স্ক বালকের স্পর্শে কিছু প্রভেদ আছে। এইরূপ যখন তাহার মনে হইত তখন

সে কয়েক দিবস সাবধানে থাকিত, বৈকুণ্ঠকে বড় কাছে আসিতে দিত না। আবার তাহার পর আমোদ আহ্লাদে, গীত গানে, সমুদয় ভুলিয়া যাইত। দুধের ছেলে আবার দুধে ছেলে হইত।

শ্যামার শূন্য, শুষ্ক, তিক্ত জীবনে নূতন আলোকের ঈষৎ রেখা দেখা দিল। আর কিছু নয়, যেন একটু স্নেহের স্পর্শ, কোমলতার আভা। রাত্রে যখন শয়ন করিয়া বিনিদ্র নয়নে চিন্তা করিত তখন আর সকলের সুখশান্তি স্মরণ করিয়া সে শুধু ব্যথিত হইত না। কত গানের সুর তাহার মনে উঠিত, হয়ত অতি অস্ফুট স্বরে গুন্ গুন্ করিয়া একটা নূতন গানের দু এক কলি গাহিত। আবার সর্ব্বব্যাপী বিষাদের ছায়া তাহার হৃদয়ে পতিত হইত। এমন করিয়া কত দিন যাইবে? কত দিন সে এমন যন্ত্রণা ভোগ করিবে, কত দিন এমন করিয়া সমস্ত বাসনা, সমস্ত সাধ নিগৃহীত করিবে? এমন কপাল লইয়াও পৃথিবীতে আসিয়াছিল! বিধাতা কেন তাহাকে এমন মন্দভাগিনী করিল, কেন তাহার প্রস্ফুটিত জীবনকুসুম এমন করিয়া অনাদরে শুকাইয়া যাইতেছিল? কত দিন কপালে এ ভোগ আছে কে জানে? পোড়া বিধবার ত মরণ নাই! এই দেখ না পিসিমা, তাঁহার ত বয়সের গাছ পাথর নাই, কিন্তু তাঁহাকে দেখিলে ত অমর বোধ হয়। ওই ও বাড়ীর ঠান্‌দিদি, মুখুয্যেদের দিদিমা, নূতন ঝীর আয়ি, সকলেই বিধবা, সকলেরই বয়সের সংখ্যা নাই, কিন্তু কেহই ত মরিবার

নাম করে না। শ্যামাকেও কি অত কাল বাঁচিয়া থাকিতে হইবে? শেষে কি দেখিতে ওই ঝীর আন্নি মাগীর মত হইবে? ঐরূপ দন্তহীন, পলিতকেশ, লোলচর্ম্ম, কোটরগত চক্ষু, কুব্জ দেহ? মা গো! তাহা হইলে শ্যামা গলায় দড়ী দিয়া মরিবে! এই রূপ, এই গড়ন, এই জলভরা মেঘের চলন, এই এক মাথা কালো কালো কোঁকড়ান চুল, এই কালো চোকের রসভরা চাহনি, কিছুই থাকিবে না, তবুও ডাইনী বুড়ীর মত বাঁচিয়া থাকিতে হইবে? তা হইলই বা? এখনই বা কোন্ রূপ লইয়া সে ধুইয়া খাইতেছে, তখনি বা তাহার গত যৌবনের জন্য কে কাঁদিবে? শুধু কপালের দোষ আর কাহারও দোষ নয়। যেমন কপাল করিয়া আসিয়াছিল তেমনি ভোগ করিতেছে। আর ভাবিয়াই বা কি হইবে? কপালে যাহা আছে তাহাই হইবে, ভাবিয়া, রাত জাগিয়া মাথা ব্যথা কেন? শ্যামা আর ভাবিতে পারে না, ঘুমে তাহার চক্ষু ভরিয়া আসিয়াছে। তবু ঘুমাইয়া পড়িবার আগে—ও কি ও শ্যামা! ও কিসের গান, কার গান এমন সময় মনে পড়িতেছে? তা, গান মনে পড়ে ত থিয়েটরের নূতন গান কেন, ঠাকুরুণ বিষয় গান মনে পড়ে না কেন?

একাদশ পরিচ্ছেদ।

একটা পর্ব্ব উপলক্ষে দীনবন্ধু বাবুর বাড়ী বন্ধু বান্ধব ও কুটুম্বদিগের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। অন্যান্য লোকের মধ্যে প্যারী-মাধব, গোবিন্দ চন্দ্র, এবং হরিচরণের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। দিনমানে লোক খাওয়াইবার হাঙ্গামা মিটিয়া গিয়াছিল, বিশেষ দুই চারি জন বন্ধু বৈকালে আসিলেন। আহার করা ইঁহাদিগের অভিপ্রায় নয় কেবল নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবার জন্য আসা। দীনবন্ধু সারাদিন এদিক ওদিক করিয়া কিছু ক্লান্ত হইয়াছিলেন। নিরিবিলি নিজের ঘরে বসিয়া একটু বিশ্রাম করিতেছিলেন।

ধনী হইলেই সকলে ঘর সাজাইতে জানে না। দীনবন্ধুর এ বিষয়ে কিছু সখ্ ছিল। যে ঘরটীতে বসিয়াছিলেন তাহাতে সজ্জার ও পারিপাট্যের বিশেষ বাহুল্য ছিল। প্যারীমাধব, গোবিন্দ চন্দ্র ও হরিচরণ বিশেষ আত্মীয় ও বন্ধু বলিয়া সেই ঘরে বসিলেন। অবশিষ্ট লোকে বৈঠকখানায় বসিয়াছিল। অভ্যাগতদিগকে সমাদর ও সৌজন্যতা প্রদর্শনের নিমিত্ত সেখানে দীনবন্ধুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও পুত্রগণ ছিলেন।

বেহাই ও বন্ধুগণের এমন ইচ্ছা ছিল না যে সেখানে অধিকক্ষণ অপেক্ষা করেন। দীনবন্ধু বদরসিক লোক। মদের কথা দূরে

থাকুক তামাকু পর্যান্ত খাইতেন না। প্যারীমাধব প্রভৃতির হুঁকাটা জুটিল বটে, কিন্তু আর কিছু মিলিবার সম্ভাবনা ছিল না। এমন স্থানে বসিয়া থাকিতে কাহার সাধ যায়? তাহাতে সন্ধ্যা বেলা—মৌতাতের সময়—এমন করিয়া শুষ্কমুখে, সাদা চক্ষে বসিয়া থাকা বড় কষ্টকর। আবার দীনবন্ধু যে ভয়ানক গম্ভীর, ডুট মজার কথা, আমোদ আহ্লাদের কথা কওয়াও কঠিন। কিন্তু দীনবন্ধুর কেমন খেয়াল চাপিল, তিনি তাঁহাদিগকে ছাড়িতে চাহিলেন না। বলিলেন, রাত্রে সকলকে আহার করিয়া যাইতে হইবে। আহারের যে পর্য্যন্ত সময় না হয় বসিয়া একটু কথা-বার্ত্তা হউক।

আরও এক মুস্কিলের কথা ছিল। গোবিন্দ চন্দ্রের একটা কুঅভ্যাস ছিল, কথার স্রোতে পড়িলে আর কিছুই মনে থাকিত না। আহার, নিদ্রা, পান পর্য্যন্ত ভুলিয়া যাইতেন। তাঁহার জন্যই দীনবন্ধু আর কাহাকেও যাইতে দিলেন না। দীনবন্ধুর সাক্ষাতে গোবিন্দ চন্দ্রের তেমন মন খুলিত না, তথাপি প্রসঙ্গক্রমে একটা কথা উঠিলে গোবিন্দ চন্দ্র চুপ করিয়া থাকিতেন না।

তখন ব হইয়া গেল। ভৃত্য ঘরে বাতি জ্বালিয়া দিয়া গেল। নিজের ক দিয়া মৃদু মৃদু সন্ধ্যাসমীরণ আসিতেছিল। তাহারা দ্ধে বলিতেছিলেন, "দেশে যে নিত্য নানা পরিবর্ত্তন তাহা হই তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। দেখ না কেন, কয়েক ভাল জা মধ্যে কত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ধর্ম্মে, সমাজে,

পরিবারে, লোকের মনে কত নূতন ভাব আসিতেছে। একদিকে ইংরাজি শিক্ষা, সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজি ভাবের আমদানি, আর এক দিকে লোকের মনে সংশয় ও অবিশ্বাস বাড়িতেছে। ফলে যে কি দাঁড়াইবে কিছুই বুঝা যায় না।”

প্যারীমাধব কহিলেন, “দুঃখ বই সুখের ত কোন লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না। অভাব কেবলই বাড়িতেছে। আমাদের জাতীয় ব্যবসা চাকরী, তাও আজকাল জোটা কঠিন। স্কুলে কালেজে লেখাপড়া করিয়া বিশ টাকার একটা কর্ম্ম মেলা ভার। খরচ কেবল বাড়িতেছে। আগে যাহার সংসার খরচ দশ টাকায় কুলাইত এখন তাহার সংসার খরচ পঁচিশ টাকায় কুলায় না। আজকালের মেয়েরাও আগের মত নাই। সেকালে বড় মানুষের বাড়ীও রাঁধুনী ছিল না, যজ্ঞ হইলেও বাড়ীর মেয়েরা নিজে রাঁধিত। এখন একজন সামান্য কেরাণীও যদি রাঁধুনী না রাখিতে পারে ত তাহার স্ত্রীর অপমান হয়। এদিকে অর্থা-ভাব, ওদিকে ব্যয়বাহুল্য। ধর্ম্মই বা কোথায়? কে এখন ধর্ম্ম মানে? কতক ভণ্ড, কতক অধার্ম্মিক। পরিবারের সুখ যাহাও বা ছিল তাহাও ক্রমে যাইতেছে। এখন বাপ বেসন্ধ্যা তদিগকে মাতৃভক্তি গিয়া ভার্য্যাভক্তি হইয়াছে, ভাইয়ে ভাগবান্‌র কনিষ্ঠ যত সব নব্য দল তাহারা কিছুই মানে না, অতীনব বাহাদুরী মনে করে। আমি ত কোন দিকেই ভাতছে। অধিকক্ষণ দেখিতে পাই না।”

হরিচরণ এ কালের ছেলেদের উপর পূর্ব্বে হইতেই চটা, কিন্তু এখন খড়্গহস্ত। তিনি বিলক্ষণ গরম হইয়া বলিলেন, "দেশ ত উচ্ছন্ন গেল! কাহার দোষে? কেবল এ কালের বাবুদের গুণে বই ত নয়। কুক্ষণে ইংরাজি শিক্ষা এ দেশে আসিয়াছিল! আমরাও কি ইংরাজি শিখি নাই! কিন্তু আমাদের সময় এত কুশিক্ষা ছিল না। এখন কেবল হুজুগ, কেবল গোল্লায় যাবার চেষ্টা। ছোঁড়াগুলা নিজেও উচ্ছন্ন যায়, আর জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারে। তাহাদের জ্বালায় কিছুতে সুখ নাই। আমি ত বলি যে যতদিন না ছেলেদের ভাল শিক্ষা হয় ততদিন কোন আশা নাই। ভাল শিক্ষা তাদের হবেও না, দেশেরও কোন কালে মঙ্গল হবে না।"

দীনবন্ধুর গাম্ভীর্য্য কিছুতেই বিচলিত হইবার নহে। তিনি গম্ভীর ভাবে কহিলেন, "আসল কথাটা কি জান? ছেলেপুলেদের শাসন করা চাই। শাসনে না রাখিলে কখন সুশিক্ষা হয় না। আমাদের দেশে লোকে শাসন করিতে জানে না, কেবল আদর দিতেই জানে। তার পর ছেলে গুলা যখন বেয়াড়া হইয়া ওঠে তখন কপাল চাপড়াইয়া মরে। কপালে কি করে? যাহারা নিজের নিজের এক একটা পরিবার বশ করিতে পারে না তাহারা কোন কাজেরই নয়। তাহারা যদি উচ্ছন্ন না যাইবে তাহা হইলে উচ্ছন্ন যাইবে কে?" দীনবন্ধু নিজে শাসন করিতে ভাল জানেন, শাসনে তাঁহার অটল বিশ্বাস।

গোবিন্দচন্দ্র এতক্ষণ তাকিয়া ঠেসান দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া শুনিতেছিলেন। এখন তিনিও কথায় যোগ দিলেন। বলিতে লাগিলেন, "এক বিষয়ে দুইজনের এক মত হয় না সত্য, কিন্তু কতক বিষয়ে কতক লোকে একমত না হইলে সমাজ তিষ্ঠিতে পারে না, এবং উন্নতিও অসম্ভব। আমাদের দেশে যে একটুও ভাবিতে জানে সে নিশ্চয় কখন না কখন দেশের অবস্থা একবার ভাবিয়া দেখে। কি হইতেছে, কি হইবে? আমরা কোন পথে যাইতেছি—উন্নতির না অবনতির? এই যে পরাধীনতা, ইংরাজের রাজ্য, ইহাতে দেশের মঙ্গল হইবে না অমঙ্গল হইবে? দেশ ত আর কিছুই নয়, সমাজের সম্প্রসারণ; সমাজ পরিবারের সম্প্রসারণ। দেশহিতৈষিতা যে বিশেষ স্বার্থশূন্য আমার ত এমন বিবেচনা হয় না। দেশের মঙ্গল হইলেই সমাজের মঙ্গল; সমাজের মঙ্গল হইলেই পরিবারের মঙ্গল; তাহা হইলেই ব্যক্তিবিশেষের মঙ্গল। যখন চারিদিকে অভাব দেখি, চিরবর্দ্ধিষ্ণু অভাব মোচনের কোন উপায় দেখিতে পাই না তখন নিজের পরিবারের জন্যই প্রথমে চিন্তা হয়। আমার সন্তানাদির কি হইবে? তাহারা কেমন করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিবে? সেই চিন্তার বিস্তৃতিতে সমাজ ও দেশের চিন্তা আসে। অতএব পারিবারিক চিন্তাই যে মহতী চিন্তার মূল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আর আমরা যে সর্ব্বদা পারিবারিক সুখ দুঃখের আলোচনা করি তাহাতেও লাভ ভিন্ন ক্ষতি নাই। তবে যদি ক্রমান্বয়ে এই

রূপ আলোচনা করিয়া আমরা নূতন কোন কথা শিখিতে না পারি, চিন্তা ক্রমাগত সঙ্কীর্ণ ও সঙ্কুচিত হইতে থাকে, যাহার যে মত সেই মত আরও দৃঢ় হয় তবে এরূপ আলোচনায় লাভ নাই, লোকসান আছে। এই যে একঘেয়ে এক কথা যে এখনকার ছেলেগুলো উৎসন্ন যাইতেছে এটা একটু তলাইয়া দেখিলে হয় না? এখন যে যুবকদিগের মধ্যে অনেক দোষ প্রবেশ করিয়াছে তাহা স্বীকার করি। পারিবারিক বন্ধনের এক প্রধান শৃঙ্খল ভক্তি—নব্য দলে ভক্তি নাই বলিলেই হয়। যে দুপাতা ইংরাজি পড়ে তাহারি মাথা ঘুরিয়া যায়, ইংরাজি অনভিজ্ঞ গুরুজনদিগকে তুচ্ছ জ্ঞান করে, অনুচিকীর্ষা অত্যন্ত বলবতী হয়, স্বদেশীয় সমাজ, সংস্কার প্রভৃতির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে। আরও হয়ত অনেক দোষাশ্রিত হয়। কিন্তু যদি তাহাদের এরূপ দোষ সঞ্চার হয় তাহা হইলে নিশ্চয়ই শিক্ষার দোষ। শিক্ষাদাতা কে? বাপ মাই প্রথমে শিক্ষাগুরু। এখনকার ছেলেরা যে আগের ছেলেদের চেয়ে স্বভাবতঃ মন্দ এমন কথা কেহই বলিতে পারে না। শিক্ষার যে দোষ জন্মিয়াছে এমন সন্দেহ হইবার অনেক কারণ আছে। ছেলেদের চরিত্র পরিবারের মধ্যে সংগঠিত না হইয়া বিদ্যালয়ে সংগঠিত হয়। যেই ছেলে পাঁচ ছয় বৎসরের হইল অমনি স্কুলে যাইতে আরম্ভ করিল, মা বাপ তাহার আর কোন খোঁজ খবর রাখেন না। হয়ত কেবল কঠোর শাসন; তাহাতে কি কখন সুশিক্ষা হয়? অনেক লোকে মনে করে যে ছেলেরা ভয় না

করিতে শিখিলে আব্‌দারে হইয়া উঠে, পিতৃ আজ্ঞা পালন করে না। ভয় দেখাইবার ফল হয় এই যে ছেলে কেবল ভয় করিতেই শিখে, ভাল বাসিতে আর কখন শিখে না। তার পর একবার যখন ভয় ভাঙ্গিয়া যায় তখন আর তাহাকে শাসন করিবার কোন উপায়ই থাকে না। শাসনের, শিক্ষার, পারিবারিক একতার প্রধান উপায়—স্নেহ। যে পরিবারে স্নেহ নাই দেখিবে সে গৃহ শ্মশানতুল্য, সকলেই স্বার্থপর, কেহ কাহারও জন্য একবারও ভাবে না। ছেলেদের দোষ না আমাদের দোষ? সন্তানদিগকে আমরা কি শিক্ষা দিতেছি, আমাদের জীবনে কি দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি? কত লোকের চরিত্রে কত রকম দোষ, কেহ বা সন্তান হইতে গোপন করে, কেহ বা প্রকাশ্যেই যথেচ্ছাচার করে। সন্তানের শিক্ষাভার কয়জন লইতে চায়? সকলেই মনে করে একটা মাষ্টার রাখিয়া দিলে কি স্কুলে পাঠাইয়া দিলেই গোল ফুরাইল, সন্তানের প্রতি কর্ত্তব্য সাধিত হইল। গৃহকর্ত্তা সংসারের কোন ভার গ্রহণ করেন না, পরিবারের ছোট ছোট সুখ দুঃখের কোন খবর রাখেন না। তিনি অর্থ উপার্জ্জন করিয়া সংসারে আনিয়া দেন, মনে করেন তাঁহার সমুদয় কর্ত্তব্য সাধিত হইল। অন্য কোন গুণই বা আমাদের আছে? কপটতা ত আমাদের ভূষণস্বরূপ; গোপনে অখাদ্য খাই, মাতার শ্রাদ্ধের সময় পৈতা গলায় দিয়া মহা ধার্ম্মিক সাজি। কত বড় কাজ থাকিতে, কত মহৎ কর্ত্তব্য থাকিতে ক্ষুদ্রাশয়ের মত আমরা কেবল ক্ষুদ্র বিষয়ে

লিপ্ত থাকি। মনে করিয়া দেখ দেখি, দলাদলির অপেক্ষা ক্ষুদ্র, উন্নতিবিরোধী আর কোন কর্ম্ম আছে? সমাজবন্ধনের মূলে কুঠারাঘাত সমাজের দোহাই দিয়াই করি। কোথায় জাতীয় উন্নতির জন্য সকলে ব্যস্ত, সকলে মিলিয়া একতা মন্ত্রোচ্চারণে আকাশ ফাটাইতেছি, আর কাজের বেলা কি না দুই শত ঘর একত্র মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে পারি না! একটা লোককে, বিশেষ একটা ভাল লোককে, এক ঘরে করিতে পারিলে বড়ই আমোদ! জাতির বলবিক্রম প্রকাশ করিবার এই এক অমোঘ উপায়। এমন জাতির উন্নতি কি করিয়া হইবে? যদি দলাদলি কেবল মূর্খের মধ্যে থাকিত তাহা হইলে বড় দুঃখের কথা নয়, কিন্তু অনেকে লেখাপড়া এক রকম শিখিয়াও ত দলাদলি করিতে ছাড়ে না। উন্নতির মূলে যে একতা, পরস্পরে যে সহানুভূতির আবশ্যক সেই মূলই উৎপাটন করিবার আমরা প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছি। যতক্ষণ আমরা আনন্দিত চিত্তে একটা মান্যগণ্য ব্যক্তিকে দলবহির্ভূত করিবার চেষ্টা করিতেছি ততক্ষণ ইংরাজ হাস্য মুখে আমাদের মাথায় পা দিয়া রাজত্ব করিতেছে! আমাদের মত সেয়ানা জাতি আর কি আছে? নিজের দোষ লোকে দেখিতে পায় না স্বীকার করি। বিশেষ যাহার যত অধিক দোষ সে তত কম দেখিতে পায়। কিন্তু এমন একটা গুরুতর বিষয়ে যতক্ষণ না আমাদের চোখ ফোটে, যতক্ষণ আত্মদোষ কিছু কিছু না দেখিতে পাই ততক্ষণ অবনতি বই আমাদের উন্নতি হইবার কোন সম্ভাবনা নাই।”

হরিচরণ রাগে গর্ গর্ করিতেছিলেন। অবসর পাইয়া কহিলেন, "তা হলে আমাদেরই সমস্ত দোষ। আর এ কালের বাবুরা একেবারে নির্দ্দোষী, নিরীহ ভালমানুষ।"

দীনবন্ধু কহিলেন, "আঃ থাম না। গোবিন্দ কি বলে শোন না।"

গোবিন্দ চন্দ্র অল্প হাস্যমুখে কহিতে লাগিলেন, "এমন কথা আমি ত বলি নাই। হয় ত ছেলে ছোকরার দল আমাদের চেয়ে আরও দোষী, কিন্তু একটা কথা মনে করা উচিত। ছেলেদের দোষ আমরা শোধরাইতে পারি, অন্যেও শোধরাইতে পারে, কিন্তু আমাদের নিজের দোষ আমরা না ত্যাগ করিলে আর কেহই সংশোধন করিতে পারে না। একটু ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখিলে সহজেই দেখা যায় যে চারিদিকে একটা প্রকাণ্ড সামাজিক যুগ-পরিবর্ত্তনের বহু চিহ্ন লক্ষিত হইতেছে। আগে যাহা ছিল তাহা কেহই আর ধরিয়া রাখিতে পারিবে না। তবে সাধ্যমত চেষ্টা করা উচিত যে নূতনে পুরাতনে মিশাইয়া যেটা ভাল হয় সেইটাই সমাজে প্রচলিত হয়। যাহা ছিল তাহা একেবারে যাইবে না, যাহা আসিতেছে তাহা সমস্তই গৃহীত হইবে না। এমন সময়ে পূর্ব্বের সামঞ্জস্য বিনষ্ট হওয়াতে নানা বিভ্রাট ঘটিবারই কথা। এই বিপর্য্যয় চিরকালের জন্য নহে, স্বল্প কালের জন্য। এই কারণে আশা হয় যে আমাদের দোষ ও এ কালের যুবাদিগের দোষ ক্রমে দূরীভূত হইবে, ও দুই দলে মিশিয়া কাজ করিতে

পারিবে। যুবকের উদ্যম ও উৎসাহ এবং প্রবীণের বহুদর্শিতা ও স্থিরবুদ্ধি নহিলে কোন মহৎ কার্য্যই সুসম্পাদিত হয় না। আর যে সব বিপদ আমরা কল্পনা করি তাঁহা অমূলকও হইতে পারে। এই যে রাজকর্ম্মের জন্য এরূপ ব্যগ্রতা ও হাহাকার, এবং চাকরী পাওয়া ক্রমে দুষ্কর হইতেছে বলিয়া নানাবিধ আশঙ্কা আমি ইহা ভাল বুঝিতে পারি না। রাজকার্য্যের সুলভতা বোধ হয় মহিমশালিতার ব্যাঘাত জন্মায়। যাহার একটি চাকরী জুটিল সে ইন্দ্রাসন প্রাপ্ত হইল, দৈনন্দিন কার্য্য সমাপ্ত হইলেই সে মনে করে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যথানিয়মে চালিত হইতেছে, ও সাহেব সন্তুষ্ট হইলে মনে করেন স্বয়ং বিধাতৃপুরুষ তুষ্ট হইলেন। চাকরী-টুকুতেই সে সদাসর্ব্বদা সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় দর্শন করে। চাকরীর অভাব পরিবার বিশেষের বা ব্যক্তি বিশেষের কষ্টের কারণ হইতে পারে, কিন্তু চাকরীর উপর নির্ভর যতই চলিয়া যাইবে, যতই অভাব বাড়িবে ততই আমাদের মঙ্গল, কেন না তাহা হইলে অভাব মোচনের নূতন উপায় আবিষ্কৃত হইবে, আত্মনির্ভরের পথ হইবে, চাকরী, সাহেব ও আপিস ছাড়া যে জগতে আরও কিছু আছে লোকের এমন বিশ্বাস হইতে আরম্ভ হইবে। আর যদি চাকরী না জুটিলে আমরা নিতান্ত অনন্যোপায় হই, চাকরীর অভাবে মারা যাই, তাহা হইলে দলে দলে গলায় কলসী বাঁধিয়া যত শীঘ্র গঙ্গাজলে ডুবিয়া মরিতে পারি ততই ধরার ভার নামিবে।”

শেষের কথাগুলা গোবিন্দ চন্দ্র কিছু বেগের সহিত কহিলেন

তাঁহার কথা সমাপ্ত হইলে আর সকলে একটী একটী নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। দীনবন্ধু কহিলেন, "আচ্ছা, শাসন যদি শিক্ষার পক্ষে ভাল না হয় তাহা হইলে কেমন করিয়া শিক্ষা দেওয়া উচিত?"

গোবিন্দ চন্দ্র কহিলেন, "শিক্ষার কোন একটা বিশেষ নিয়ম হইতে পারে না, তবে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে স্নেহশূন্য শিক্ষা শিক্ষাই নয়, অশিক্ষা। পড়া না হইলে বাবা মারিবেন, যদি কেবল এই ভাবটী ছেলের মনে হয় তাহা হইলে কখন তাহার সুশিক্ষা হইবে না, হয়ত সহজে যে টুকু শিক্ষা হয় মারের ভয়ে সে টুকুও হয় না; পড়া হইলে বাবা খুসী হইবেন, এই ভাবটীও মনে হওয়া চাই। ভালবাসা নহিলে কোন বন্ধনই হইতে পারে না; বন্ধন নহিলে পারিবারিক শৃঙ্খলা রক্ষিত হয় না। মোটামুটি শিক্ষা-প্রণালী আমি এইরূপ বুঝি; নিজের জীবন এমন হওয়া উচিত যে সে দৃষ্টান্ত দেখিয়া ছেলের চরিত্র না দূষিত হয়। শিক্ষার সময় কঠোরতার আবশ্যক করে না, স্নেহপূর্ণ গাম্ভীর্য্য যথেষ্ট। সন্তানের সহিত নিঃসঙ্কোচে কথোপকথন, ও সেই ছলে উপদেশ, তাহার প্রতি বিশ্বাস, এবং অপরের নিকট তাহার নিন্দা অথবা সুখ্যাতি না করা। এই উপায়ে পুত্রের শিক্ষা হইলে আমার মনে হয় সে পুত্রের জন্য পিতা একদিনও কষ্ট পান না।"

হরিচরণ তর্কটা পুনরুত্থাপনের চেষ্টা করিতেছিলেন, এমন সময় চাকর সংবাদ দিল, আহার প্রস্তুত।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

যে দিন রজনীকান্ত অজ্ঞাতসারে বেশ্যাগৃহে প্রবেশ করিয়াছিল সেই দিন হইতে সে মনে মনে সঙ্কল্প করিয়াছিল যে রমানাথের সহিত আলাপ বন্ধ করিবে। তাহার বড় রাগ হইয়াছিল, ভয়ও হইয়াছিল। সেই সময় যদি কেহ দেখিতে পাইত? দেখিতে পাইয়া যদি কেহ রজনীকান্তের পিতাকে বলিয়া দিত? রমানাথ যে এমন লোক সে তাহা জানিত না। সে তাহাকে ভাল ছেলেই মনে করিত।

পরদিবস রজনীকান্তের শ্বশুর বাড়ী নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। রাত্রে যখন শয়ন করিতে গেল তখন চারুবালা বিছানায় শুইয়া আছে। স্বামীকে দেখিয়া একটু হাসিল।

অন্যান্য কথার পর রজনীকান্ত বলিল, "কাল কোথায় গিয়েছিলাম বল দেখি?"

চারুবালা কহিল, "তা আমি কি জানি, তুমি বলনা।"

রজনীকান্ত বলিল, "আচ্ছা, তুমি আন্দাজে বল দেখি?"

"বেশ্যাবাড়ী গিয়াছিলে?"

"তাই।"

"কি বল্‌লে আর একবার বল দেখি!" বলিয়া চারুবালা একেবারে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। তাহার পর বিছানা হইতে উঠিয়া ঠিক্‌রিয়া দূরে দাঁড়াইল। তাহার মাথার কাপড় খসিয়া গেল, কপালের উপর চুল উস্ক খুস্ক হইয়া গেল। ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতে লাগিল, অর্দ্ধ অনাবৃত হৃদয় অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। দুই হাতের অঙ্গুলি বদ্ধ করিয়া কেবল বলিতে লাগিল; "কি বল্‌লে আবার বল দেখি!" বলিতে বলিতে তাহার হাঁপ লাগিতে লাগিল।

মহামূর্খ রজনীকান্ত তখন দেখিল যে সে কেঁচো খুঁড়িতে গিয়া সাপ বাহির করিয়াছে। সম্মুখে নিশ্বসিত সর্পিণীতুল্য কিশোরী ভার্য্যা দাঁড়াইয়াছিল। রজনীকান্ত হতবুদ্ধির মত দাঁড়াইয়া রহিল।

মূর্খের নানা দোষ। যদি রজনীকান্তের শাস্ত্রজ্ঞান থাকিত তাহা হইলে তাহার স্মরণ হইত যে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং পত্নীর নিকটে মিথ্যা ভাষণে অনুমতি দিয়াছেন। তিনি বহু পত্নী সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন এক পত্নীর সম্বন্ধেও তাহা সত্য। আর যাহাই বল, পত্নীর নিকট কখন অন্য স্ত্রীলোকের নামোল্লেখ করিও না। তাহা হইলেই প্রলয় কাণ্ড উপস্থিত হইবে। সত্য হউক, মিথ্যা হউক, পত্নীর মনে একবার সংশয় উদিত হইলে আর রক্ষা নাই। যে সাধ করিয়া এমন সংশয় উপস্থিত করে সে নিজের বিপদ আপনি ডাকিয়া আনে। লোকে এ কথা শাস্ত্র পড়িয়া না শিখুক, ঠেকিয়া

শিখে। রজনীকান্ত পড়েও নাই, ঠেকেও নাই। সে মনে করিয়াছিল, তামাসার কথাটা একটু তামাসা করিয়া বলিবে। সে সাধ করিয়া বেশ্যালয়ে যায় নাই, সেখানে কোনরূপ অন্যায়াচরণও করে নাই। আর কাহাকেও বলিবার তাহার ইচ্ছা ছিল না, তবে স্ত্রীকে ভালবাসে বলিয়া সকল কথা তাহার কাছে খুলিয়া বলিবে মনে করিয়াছিল। কিন্তু অভিপ্রায় ভাল হইলে কি হয়, বলাটা বড়ই বোকামি হইয়াছিল।

এখন রজনীকান্তের তামাসা ঘুরিয়া গেল। তাহাকে চুপ করিতে দেখিয়া চারুবালার রাগ বাড়িতে লাগিল, মনে করিল সমস্তই বুঝি সত্য। রাগে তাহার স্বর উঠিতে লাগিল, আরও কথা জুটিতে লাগিল। "কি বল্‌লে আবার বল দেখি! বেশ্যা-বাড়ী যাওয়া হয়েছিল? তা আর সব গুণ হয়েছে, ওটা বাকি থাকে কেন? আজ এখানে এসেছ কেন, সেই সুন্দরীর কাছে যাও না!"

যে চারুবালার কথা ঘোমটার ভিতর মিলাইয়া যাইত, স্বামীর নিকটে যাহার লজ্জা কিছুতে আর টুটিত না আজ সেই চারুবালা মাথার কাপড় খুলিয়া, রাগে অন্ধ হইয়া স্বামীকে ভৎর্সনা করিতে লাগিল। রজনীকান্ত অত্যন্ত ভীত হইয়া কহিল, "চুপ কর! সকলে যে শুন্‌তে পাবে।"

"শুন্‌তে পাবে তাই তোমার ভয়। আমি নিজেই সকলকে বল্‌ব। এমন গুণ ঢাকা থাক্‌বে না।"

রজনীকান্ত সাহস করিয়া স্ত্রীর নিকটে গেল। কহিল, "না জেনে শুনে রাগ কর কেন? আগে কথাটা শোনই না।" বলিয়া চারুবালার হাত ধরিতে উদ্যত হইল। ইচ্ছা তাহাকে খাটে বসাইয়া সমস্ত কথা বুঝাইয়া বলিবে।

চারুবালা দরজার নিকট গিয়া খিল খুলিতে উদ্যত হইল। কহিল "যদি তুমি আমায় ছোঁও তা হলে চেঁচিয়ে লোক জড় করব।"

রজনীকান্ত বেগতিক দেখিয়া তাড়াতাড়ি পিছাইয়া পড়িল। দূর হইতে কহিল, "আমি সত্য বল্‌ছি আমি নিজে যাইনি। কিছুই করিনি। তুমি কথাটা শোন না।"

অবশেষে অনেক করিয়া চারুবালা কথাটা শুনিতে স্বীকার করিল। রজনীকান্ত ইহার মধ্যে ঠেকিয়া শিখিয়াছিল। সমস্ত কথা চারুবালাকে বলিল না। রমানাথ ও তাহাতে বৃষ্টির সময় একটা বেশ্যার দরজায় দাঁড়াইয়াছিল এই টুকু বলিল। বেশ্যার ঘরে বসিয়া তাহার পান খাইয়াছিল ও বেশ্যাটা তাহার হাত ধরিয়াছিল একথা গুলা প্রকাশ করিল না। রজনীকান্ত বুঝিয়াছিল যে তাহা হইলে চারুবালার রাগ কিছুতেই পড়িবে না।

চারুবালা কহিল, "তা, দাঁড়াবার আর কি জায়গা ছিল না?"

রজনীকান্ত তখন ভরসা পাইয়া কহিল, "আমি কি জানি কার বাড়ী? তারপর যখন দেখ্‌লাম বেশ্যাবাড়ী তখন আমরা তুইজনে বেরিয়ে বিষ্টিতে ভিজ্‌তে ভিজ্‌তেই বাড়ী এলাম।"

একটু মিথ্যা বলিয়া রজনীকান্ত নিজেকে নির্দ্দোষী প্রমাণ করিল ও সেই সঙ্গে রমানাথও খালাস পাইল।

কতক্ষণ পরে চারুবালার রাগ পড়িল। রজনীকান্ত আবার তাহাকে আনিয়া খাটে বসাইল।

রমণী চিরকাল, সকল বয়সে, ক্ষমাময়ী, কিন্তু প্রথম বয়সে কেবল ক্ষমাময়ী নহে, বিস্মৃতিময়ী। চারুবালার যে বয়স সে সময় জীবন আনন্দময়, শোকের, ক্রোধের, অথবা ক্লেশের ছায়া সে আনন্দকে অধিক কাল ঢাকিতে পারে না। কেবলই হাসি, কেবলই আমোদ। সময়ে অসময়ে, কারণে অকারণে হাসি; কেহ ভাল কথা বলিলে হাসি, কেহ মন্দ কথা বলিলে হাসি। দুঃখ পাইলে যদি কান্না পায় আবার তখনি হাসি আসে। লহরীলীলাচঞ্চল, চূর্ণিত, প্রক্ষিপ্ত সূর্য্যকিরণে আলোকিত জীবন নিশীথের অন্ধকার কিরূপ তাহা অনুভব করিতে পারে না। কিয়ৎ কাল পরেই চারুবালা পূর্ব্বের মত কথা কহিতে লাগিল, হাসিতে লাগিল, সব ভুলিয়া গেল। রাগ করিয়াছিল কি না তাহাও ভুলিয়া গেল। প্রভাতে সে রজনীকান্তের গলা জড়াইয়া ধরিয়া, আদর করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আবার কবে আস্‌বে?"

রজনীকান্ত গলিয়া গিয়া বলিল, "যবে বল।"

"শীঘ্র এস।"

"তুমি কেন আমাদের বাড়ী এস না?"

"আমি কি যাবনা বলেছি?"

"আচ্ছা, তবে, আমি মাকে বল্‌ব।"

"দূর বেহায়া! অমন কথা কি বলা যায়?"

"তা না হয় তুমি বলে পাঠিও।"

"ঈশ্‌, আমার বড় গরজ কি না। ওঁর জন্য প্রায় আমার ঘুম হয় না।" বলিয়া, ঘাড় বাঁকা করিয়া, হস্তভঙ্গী করিয়া, আড়ে চাহিয়া চারুবালা ঠোঁট ফুলাইল।

রজনীকান্ত সেই ফুলো ফুলো মুখে, গালে চুম্বন করিয়া চলিয়া গেল। সোহাগে তাহার বুক ফুলিয়া উঠিল, পথ চলিতে মাটীতে পা পড়িতেছে কি আর কোথাও পড়িতেছে তাহার বড় জ্ঞান ছিল না।

ক্ষমা গুণ সংক্রামক। রজনীকান্ত স্ত্রীর নিকট আত্মদোষের ক্ষমা প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত জগৎ ক্ষমাচক্ষে দেখিতে লাগিল। রমানাথকে অমন করিয়া মন্দ কথাগুলা বলা ভাল হয় নাই। রমানাথ এমন যে কিছু গুরুতর অপরাধ করিয়াছিল তাহাও নহে। রজনীকান্ত সেই বেশ্যাটার বাড়ীতে গিয়া তামাকু পর্য্যন্ত খায় নাই। পানটা রমানাথ জোর করিয়া মুখে পূরিয়া দিয়াছিল —সেটা তাহার দোষ। কিন্তু অমন তামাসা বন্ধুদিগের মধ্যে সর্ব্বদাই চলিয়া থাকে। এত দিনের বন্ধুত্ব কি এক দিনে বিচ্ছিন্ন করা উচিত? যাহাই হউক রমানাথ বুদ্ধিমান, তাহার সঙ্গে থাকিলে অনেক কথা শিখা যায়। বৃষ্টি যদি না পড়িত তাহা হইলে রমানাথ

কখনই সে বাড়ীতে দাঁড়াইত না, রজনীকান্তকে কখনো তুমি আর যাইত না। বৃষ্টির সময় আর কখন বাহিরে না গেলেই রজনীকান্ত মনে করিয়াছিল যে চারুবালাকে সমস্ত কথা বলিতে কিন্তু সে যে অবুঝ, যে রাগী, সব কথা বলিলে রক্ষা থাকিত না। কি কি কথা বলা হয় নাই? রমানাথ তাহাকে হাত ধরিয়া উপরে টানিয়া লইয়া না গেলে রজনীকান্ত নিজে কখন যাইত না। সে জোর করিয়া হাত ছাড়াইয়া লইতে পারিত, কিন্তু বেশ্যাটা দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল। তাহার নামটা কি ভাল? আতর! এমন মজার নাম কেহ কখন শুনিয়াছে? রজনীকান্ত যখন উপরের ঘরে গিয়া বসিল তখন আতর কি রকম করিয়া দাঁড়াইয়াছিল? আবার যখন রজনীকান্ত চলিয়া আসে তখন তাহার হাত ধরিয়া কেমন করিয়া টিপিয়াছিল? তাহার হাত বেশ নরম, না? চোকও বেশ। ছি! ছি! বেশ্যাটার কথা আবার কেন? রমানাথের কথাই মনে হইতেছিল। রজনীকান্ত মনে মনে লজ্জিত হইল। রমানাথের বিষয় ভাবিতে ভাবিতে আত-রের কথাও মনে আসে। দূর হউক ছাই! সে কথা মনে করি-বার আর কোনই প্রয়োজন নাই। আবার যদি রমানাথ আসে তাহা হইলে রজনীকান্ত সে দিনকার কথা ভুলিয়া যাইবে। কিন্তু সেই দিন হইতে রমানাথ আর ত আসে না। বোধ হয় তাহার দুঃখ হইয়াছে। মন্দ কথা বলিলে কাহার না মনে দুঃখ হয়? আচ্ছা, রমানাথ যদি আবার না আসে তাহা হইলে তাহার

"আমি দিওয়া উচিত কি না? যাহা হইয়া গিয়াছে তাহা হইয়া

"আচ্ছা। এখন সে জন্য রাগ করা ছেলেমানুষী।

সেইদিন বৈকালে রজনীকান্ত রমানাথের বাড়ী গেল। রমানাথ বাড়ীর বাহিরে দাঁড়াইয়া জুতাবুরুশওয়ালাকে দিয়া জুতা পরিষ্কার করাইতেছিল। রজনীকান্তকে দেখিয়া হাস্যমুখে কহিল, "কে ও রজনী যে! কি খবর?"

রমানাথের কথায় রাগের, দুঃখের, অথবা অভিমানের কোনই চিহ্ন নাই। রজনীকান্ত একটু অপ্রতিভ হইয়া কহিল, "সেদিন তোমায় রাগের মুখে মন্দ কথা বলেছিলাম, রাগ কর নি ত?"

রমানাথ গম্ভীর মুখে কহিল, "হাঁ, বড্ড রাগ কোরেছি। এ কয়দিন বাড়ীতে আর ভাত জুগিয়ে উঠ্‌তে পারে না। রাগটা বাড়ীর ভাতের উপর দিয়েই গেল।"

রজনীকান্ত না হাসিয়া থাকিতে পারিল না। কহিল, "তোমার কিছুতেই রাগ হয় না।"

"রেগে ফল? রাগ্‌লে শরীর গরম হয়, মেজাজ গরম হয়। একে দেশ গরম তার উপর আবার গরম হলে বিষম বিপদ। রাগারাগিতে রমানাথ নেই, বাবা! মজার কথায় আছি।"

রজনীকান্ত বলিল, "কিন্তু দেখ সে দিন তুমি ভারি অন্যায় করেছিলে। জেনে শুনে কি না একটা বেশ্যা বাড়ীতে দাঁড়ান?"

রমানাথ কহিল, "না জেনে শুনে দাঁড়ালে বেশ হত, কেমন? আচ্ছা, বাবা, এবার তাই হবে।"

"সে কথায় আর কাজ নেই। ও রকম তামাসা তুমি আর আমার সঙ্গে কোরো না।"

রমানাথ বলিল, "তামাসা কে করচে? দেখ যদি পৃথিবীতে কিছু শিখ্‌তে হয় ত সকল রকম দেখ্‌তে শুন্‌তে হয়। তা নইলে ঘরের কোণে জুজু বুড়ীটির মত বসে থাক্‌তে হয়। দেখ্‌তে শুন্‌তে কোন দোষ নেই। আমি ত এই সব তাতেই আছি, কিন্তু আমি ধর ছোঁয়া দেবার ছেলে নই।"

রজনীকান্ত কহিল, "সকলেই কি এখন তোমার মত হতে পারে? আমি ত তোমার মত স্বাধীন নই, আমায় একটু বুঝে সুঝে চল্‌তে হয়।"

রমানাথ কহিল, "সে কথাটা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। সে দিন বাড়ীতে বাবা বেতপেটা করেনি ত।"

রজনীকান্ত হাসিতে লাগিল। কহিল, "তুমি আর জ্বালিও না।"

তার পর দুইজনে বসিয়া নানা কথা কহিতে লাগিল। রমানাথ অবশেষে বলিল, "আর একদিন আতরের বাড়ী যাবে?"

রজনীকান্ত রাগিয়া উঠিল, "ফের ওই কথা?"

"রাগ কেন ভাই! তা না হয় ও কথা আর বল্‌ব না। কিন্তু আতর তোমার বড় সুখ্যাতি কর্‌ছিল। কি বল্‌ছিল, জান?"

রজনীকান্ত বিরক্ত হইয়া কহিল, "আর কি কোন কথা নেই? ঐ কথাই যদি কেবল বল তা হলে আমি চল্‌লাম।"

রমানাথ তখনি কথা ফিরাইল। কিছুক্ষণ পরে রজনীকান্ত অন্যমনস্ক হইয়া নিজেই জিজ্ঞাসা করিল, "কি বলেছিল ?"

"বলেছিল যে তোমার মত ভালমানুষ কখন দেখে নি। আর বল্‌ছিল যে তোমার চোক বড় চমৎকার। আবার তোমায় দেখ্‌তে চায়।"

"দূর কর ছাই ! কেবলই ঐ এক কথা।"

মৃদু হাসিয়া রমানাথ কহিল, "এবার ত আমি কথা পাড়ি নি। তুমি জিজ্ঞাসা কর্‌লে তাই উত্তর দিলাম।"

রজনীকান্ত লজ্জিত হইয়া চুপ করিল। তার পর আর বড় কথাবার্ত্তা হইল না। গমনকালে রজনীকান্ত কহিল, "তুমি আগের মত এস, একসঙ্গে বেড়াতে যাওয়া যাবে।"

রমানাথ বলিল, "আমারও একা কোথাও যেতে ভাল লাগে না।"

রজনীকান্ত চলিয়া গেলে পর রমানাথ বসিয়া তামাকু টানিতে লাগিল। তাহার মুখে হাসি দেখা দিল। অর্দ্ধস্ফুট স্বরে কহিল, "ঘুঘু দেখেছ বাবা, ফাঁদ ত দেখ নি ! তা এইবার দেখ্‌বে। রমানাথ বেঁচে থাকুক, অনেক রকম দেখ্‌বে।"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

কলিকাতায় হেমন্তকুমার যে বাসায় থাকিত সেই বাসায় আদিত্যচরণ নামে আর এক জন যুবক থাকিতেন। ইনি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যাভ্যাস সাঙ্গ করিয়া শিক্ষকের কর্ম্ম করিতেন। গৃহে কেহ ছিল না, এ পর্য্যন্ত বিবাহ করেন নাই, এজন্য অর্থাভাব বা অর্থচিন্তাও বড় ছিল না। আদিত্যচরণ হেমন্তকুমারের অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ। দুইজনে সোদরের ন্যায় প্রণয় ছিল। আদিত্য-চরণ কৃতবিদ্য, চিন্তাশীল, গম্ভীরস্বভাব। হেমন্তকুমার তাঁহাকে মান্য করিত। সকল বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিত, তাঁহার পরামর্শানুযায়ী কর্ম্ম করিত। প্রায় কোন কথাই তাঁহার সাক্ষাতে গোপন করিত না।

একটা কথা কেবল মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিত না। মনে করিত বলিবার মত কোন কথাই নাই। স্বর্ণময়ীর কথা কি বলিবে? এমন কত বালক বালিকার মধ্যে প্রণয় সঞ্চার হয়, অবশেষে পরস্পর পরস্পরকে ভুলিয়া যায়। বাল্যপ্রণয় পরিশেষে বাল্যস্মৃতি মাত্রে পরিণত হয়। হেমন্তকুমার মনে করিত তাহার হৃদয়ে এই প্রণয়ের মূল যেমন দৃঢ় হইয়াছিল, স্বর্ণময়ী বালিকা, তাহার মনে সেরূপ হয় নাই। বাল্যকাল হইতে সর্ব্বদা দেখা

সাক্ষাৎ আছে বলিয়া বালিকার মনে একটু স্নেহের লেশ থাকিতে পারে। তাহার বিবাহ হইয়াছে, দুই দিন পরে শ্বশুরবাড়ী যাইবে, স্বামীকে ভালবাসিতে শিখিবে, পূর্ব্ব কথা বিস্মৃত হইয়া যাইবে। স্মরণ করিয়া রাখিবার মত কথাই বা কি ছিল? দুই জনে কখন প্রণয়ের কথা হয় নাই, কখন উভয়ে উভয়কে আত্মদান করিতে প্রতিশ্রুত হয় নাই, প্রেমের উন্মত্ততা কেমন তাহারা তাহা জানে নাই। কবে যেন মুহূর্ত্তের জন্য তাহাদিগের জীবনাকাশে করতলপরিমিত একখণ্ড পাটলরাগরঞ্জিত মেঘ উদিত হইয়াছিল, ক্ষণকালের পরে অদৃশ্য হইল। সেই মেঘের চিহ্ন কি চিরকাল আকাশে থাকিবে? তাহাদিগের দুই জনের মধ্যে প্রেম কেমন করিয়া থাকিতে পারে? হেমন্তকুমার উত্তম শিক্ষা লাভ করিতেছিল, তাহার চিত্ত নির্ম্মল, মনে কখন পাপচিন্তাকে স্থান দিত না, সে কেমন করিয়া এরূপ অবৈধ বাসনাকে মনে স্থান দিবে? যত দিন স্বর্ণময়ী অবিবাহিত ছিল ততদিন না হয় তাহার আশা মনে রাখিল, কিন্তু তাহাতেও পাপ আছে, কারণ যে সমাজে কন্যা স্বয়ম্বরা হইতে পারে না, আত্মদানের ক্ষমতা নাই, সে সমাজে অবিবাহিত কন্যাকেও প্রণয়চক্ষে দর্শন করা পাপ। কিন্তু স্বর্ণময়ী অপরের পরিণীতা, কিছু দিন পরে তাহার দর্শন পর্য্যন্ত দুর্লভ হইবে। তাহার চিন্তা একেবারেই পরিহার্য্য।

বুদ্ধি বলে এই কথা, কিন্তু বুদ্ধি দ্বারা কি হৃদয়ের বেগ রোধ করিতে পারা যায়? হেমন্তকুমার যেমন স্বর্ণময়ীর মাতুলালয়ে

যাতায়াত করিত সেইরূপ যাতায়াত করিতে লাগিল। মনে যদি কখন আত্মগ্লানি হইত হৃদয়ের যুক্তিবলে আবার তাহা অপনীত হইত। স্বর্ণময়ীকে দেখিবার আশায় সে কেন যাইত? মনে করিত কিছু দিন পরে ত আর দেখিতে পাইবে না, এখন যে কয় বার দেখিতে পায় তাহাতে বঞ্চিত হইবে কেন? অতৃপ্ত নয়নে কিশোরীকে দেখিয়া মনে করিত এই উজ্জ্বল চিত্র তাহার স্মৃতি-পটে চিরদিন অঙ্কিত রহিবে, কালস্রোতের প্রক্ষালনে ধৌত হইবে না। না দেখিলেই কি ভুলিতে পারিত? বারম্বার দেখিয়া সেই প্রতিমূর্ত্তি তাহার হৃদয়ে অগ্নিময় অক্ষরে খোদিত হইতেছিল, হৃদয়ের দাহশব্দ যেন তাহার শ্রবণে প্রবেশ করিতেছিল। যদি একবার মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিত তাহা হইলে স্বর্ণময়ী কি তাহাকে আত্মদানে অস্বীকৃত হইত? কেবল সমাজের নিষ্ঠুর শাসনে তাহারা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইল। হেমন্তকুমারের সহিত বিবাহ হইলে স্বর্ণময়ী কি অপাত্রে পতিত হইত? তাহাকে সুখে রাখিবার জন্য হেমন্তকুমার হাস্যমুখে কি সর্ব্বস্ব প্রদান করিত না? নিষ্ঠুর সমাজ, নিষ্ঠুর আত্মীয় স্বজন, কাহার হৃদয়, কাহার জীবন, কাহার সর্ব্বস্ব চরণতলে দলিত হইতেছে কেহ ফিরিয়া দেখে না!

প্রকাশ্যে কোন কথা না কহিলেও হেমন্তকুমার আদিত্য-চরণের সহিত কথাপ্রসঙ্গে স্বীয় মনোগত ভাব অনেক সময় ব্যক্ত করিত। এক দিন আদিত্যচরণকে কহিতেছিল, "মানুষের

মন যদি স্বায়ত্ত হয় তাহা হইলে মানুষের সুখ দুঃখ স্বায়ত্ত নয় কেন ?”

আদিত্যচরণ বলিলেন, “নয় কে বলিল ?”

হেমন্তকুমার। “সুখ দুঃখ আপনার হাতে কেমন করিয়া বলিব ? আমরা যাহা চাই তাহা কি কখন পাই ? যে সুখ দুষ্প্রাপ্য নয়, যে আশা দুরাশা নয় তাহাও পূর্ণ হয় না। সমাজের অত্যাচার পদে পদে আমাদিগকে বিড়ম্বিত করে। আমাদের কি সাধ্য আমরা বাঞ্ছিত সুখ লাভ করি !”

আদিত্যচরণ কহিলেন, “এক হিসাবে ধরিতে গেলে কিছুই আমাদের ক্ষমতাধীন নয়। যে যাহা চায় সে তাহা পায় না, অনেক সময় পাইলেও সুখ হয় না। কিন্তু সুখ ও দুঃখ কিসে প্রথমে বিবেচনা করা উচিত। যাহা অভিলষিত তাহা প্রাপ্ত হইলেই কি সুখ হয় ? মনুষ্যের স্বভাবগত যে দুর্নিবার্য্য ভোগ-পিপাসা তাহার কি নিবৃত্তি আছে, না আকাঙ্ক্ষার ইয়ত্তা আছে ? আকাঙ্ক্ষায় সুখ নাই, ভোগে সুখ নাই, বাসনার পরিতৃপ্তি নাই এই কথার উল্লেখ সকল দেশের গ্রন্থেই ভূয়োভূয়ঃ দেখিতে পাইবে। মানুষের স্বভাব সকল দেশে সকল কালে সমান ; এই জন্য মনস্তত্ত্বজ্ঞ মনীষিগণ চিরকালই এই শিক্ষা দিয়া আসিতেছেন যে সুখের কামনা পরিহার্য্য। যাহাকে আমরা সুখ মনে করি তাহা হয়ত দুঃখের নামান্তর মাত্র ! তৃষিত নয়নে যেখানে শীতল সরোবর দেখিতে পাই সেখানে হয়ত মরীচিকা

ব্যতীত অ ... ই নাই। যে সামান্য ভোগ সুখের আশা পরিত্যাগ ... ন্য প্রকার সুখেব অন্বেষণ কবে তাহারই কি অভীষ্ট সিদ্ধ ... মি সুখ কাহাকে বল?"

হেমন্ত ... "যাহা দুষ্প্রাপ্য, যাহা আশাতীত তাহাব কামনা কর ... স্বীকার করি। কিন্তু সেরূপ কামনা কয় জন করে? মা ... ন কিছু প্রার্থনা করিবে না, কখন কোন আশা করি ... হাও কি সম্ভব? তাহা হইলে মনুষ্যের সৃষ্টি হইল কেন, ... মনে সহস্র আশা, আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি হইল কেন? কখন ... সুখেব আশা কবিবে না, কিছু কামনা করিবে না ... কেহ বলিতে পারে না। যদি কিছুই প্রার্থনীয় বা কমনীয় ... ল তাহা হইলে জীবনের বন্ধন রহিল কি? সুখ কাহাকে ... ? যে ইচ্ছা বৈধ, বয়স, অবস্থা ও কালের অনুযায়ী, এ ... খের ইচ্ছাও কি দোষের? যৌবনে বিশুদ্ধ প্রেমের আক ... ক দূষণীয়?"

আদিত্য ... হেমন্তকুমারের প্রতি তীক্ষ্ণ কটাক্ষপাত করিয়া কহিলেন, " ... মানুষের স্বভাবানুমোদিত তাহা ত দেখিতেই পাইতেছি। প্রণয়ও ত অনেক সময় মহা অসুখের কারণ হয়। তাহার কি?"

হেমন্তকু ... কিছু বেগের সহিত কহিল, "আমি বিশুদ্ধ প্রেমের কথা ... তেছি। মনে কর, তুমি কোন রমণীকে ভাল বাস। ... তে, কুলে, বংশমর্য্যাদায় তুমি তাহার

বা কেমন করিয়া প্রাণ ধরিয়া স্বর্ণময়ীকে পরের হস্তে সমর্পিত হইতে দেখিল? একদণ্ডে তাহাদের সুখের আশা চিরকালের তরে নির্ব্বাপিত হইল! সমাজ বিলুপ্ত হউক, পৃথিবী ধ্বংস হউক, চন্দ্র সূর্য্য নিভিয়া যাউক, নবীন বয়সে হেমন্তকুমারের জীবন অবিচ্ছিন্ন অনন্ত অন্ধকারে মগ্ন হইল কেন?

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

গোবিন্দ চন্দ্র বসুর গৃহে আর কেহ নাই, কেবল স্ত্রী। সন্তানাদি হয় নাই। স্ত্রী রূপবতী, নানা গুণে গুণবতী, স্বামীকে দেবতার ন্যায় জ্ঞান করিতেন। গোবিন্দ চন্দ্রের স্বভাব নিতান্ত মন্দ ছিল না। সঙ্গীরা না জুটিলে, মদ না খাইলে কোন বালাই ছিল না। গোবিন্দচন্দ্র মার্জ্জিতবুদ্ধি, পণ্ডিতাগ্রণী, আপনার কর্ম্মে দক্ষ। অন্য সকল গুণই ছিল, কেবল চিত্তের বল ছিল না। যে যে দিকে তাঁহাকে ফিরাইত তিনি সেই দিকে ফিরিতেন। তাঁহার স্বভাবে ভোগের লালসা বা প্রবৃত্তি ছিল না, কিন্তু কোন বিষয়ে বিরক্তিও ছিল না। এই জন্য তাঁহার এমন বন্ধু জুটিয়াছিল। পত্নী সুকুমারী যেন কিছু দেখিয়াও দেখিতেন না। এ পর্য্যন্ত তাঁহার কষ্টের বিশেষ কোন কারণ হয় নাই এ জন্য তিনি নীরবে রহিতেন। পুরুষের সুখের ইচ্ছা স্ত্রীলোকের অপেক্ষা কিছু বেশী এ কথা সকলে জানে। পুরুষ মানুষে একটু মদ খাইবে, একটু আমোদ আহ্লাদ করিবে, তাহাতে আর স্ত্রীলোকে কি বলিবে? বিশেষ এমন যে কোন দোষ গোবিন্দচন্দ্রের হইয়াছিল এ কথাও বলা যায় না। কখন কদাচ দুই এক মাসে হয়ত এক রাত্রি

বাড়ী আসিতেন না, কিন্তু পর দিবস স্ত্রীর নিকটে অনুতপ্ত হইয়া বিস্তর আত্মগ্লানি করিতেন ও বন্ধুদিগের নিন্দা করিতেন। হয়ত কিছু দিন তাহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন না। সুকুমারী কি মনে করিবেন? ঘরে আর কেহ ছিল না, সারাদিন পরিশ্রম করিয়া পুরুষ মানুষের একটু আমোদ আহ্লাদ করিবার ইচ্ছা হইবারই কথা। গোবিন্দচন্দ্র যে বড় বাড়াবাড়ি করিতেন না ইহাই কত সৌভাগ্য! আর কেহ হইলে, এমন অবস্থায় পতিত হইলে হয়ত একেবারে উৎসন্ন যাইত। এই কথা স্মরণ করিয়া সুকুমারী কিঞ্চিৎ শান্তি লাভ করিতেন। কিন্তু গোবিন্দচন্দ্র তেমন সাবধানে থাকিতে পারিতেন না। কতবার প্রতিজ্ঞা করিতেন অসচ্চরিত্র বন্ধুদিগের সহবাস ত্যাগ করিবেন কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা কিছুতেই রক্ষা করিতে পারিতেন না। চিত্তের দৃঢ়তার অভাব, ইচ্ছারও কতক অভাব। তিনি ভাবিতেন, স্বেচ্ছাচারে যদি সুখ না থাকে ত সংযমেই বা কি সুখ আছে? কাহার জন্য, কিসের জন্য, তিনি সকল ভোগ সুখে বঞ্চিত থাকিবেন? সুকুমারীর জন্য? তাঁহাকে তিনি ত কোন দুঃখ দিতেন না, কখন তাঁহার অবমাননা করিতেন না। সুকুমারী সংসারের কর্ত্রী, স্বামীর ঐশ্বর্য্য সম্পত্তির ঈশ্বরী, স্বামীর স্নেহ প্রণয়ের পাত্রী। আর কি চাই? আর সমুদয় ত্যাগ করিয়া গোবিন্দ চন্দ্র কি দিবারাত্রি স্ত্রীকে লইয়া থাকিবেন? এমন আশা মনে স্থান দেওয়াই অন্যায়। সুকুমারীও অতখানি আশা করিতেন না।

তিনি যদি কোন কালে, স্বামীর পূর্ণ ও ঐকান্তিক অনুরাগ না জানিতেন তাহা হইলে হয়ত গৃহসংসার সম্পত্তি লইয়াই সুখী থাকিতেন, অন্য সুখের আশা করিতেন না। কিন্তু স্বামীর ভালবাসা তিনি পাইয়াছিলেন ; সে সুখে বঞ্চিত হইতে তাঁহার হৃদয়ে বড় ব্যথা লাগিত। যখন গোবিন্দচন্দ্র ঘন ঘন বাহিরে যাইতে আরম্ভ করিলেন, প্রায় সপ্তাহে একদিন কি দুই দিন করিয়া কোন না কোন বন্ধু আসিয়া তাঁহাকে লইয়া যায়, কোন রাত্রে বাড়ী ফেরেন, কোন রাত্রে ফেরেন না, যখনই ফিরিয়া আসেন তখনই মাতালের আকৃতি, তখন সুকুমারীর ভাবনা হইতে আরম্ভ হইল, ভয় হইতে আরম্ভ হইল। একদিন সময় বুঝিয়া স্বামীকে কহিলেন, "তুমি রাত্রে যদি বাহিরে না যাও তা হলে আমি নিশ্চিন্ত থাকি। আগে তুমি ত এত বাহিরে যেতে না।"

গোবিন্দ চন্দ্র কিছু লজ্জিত হইয়া কহিলেন, "আমি কি সাধ করিয়া যাই ? ওরা সব যে পীড়াপীড়ি করে! আমি ত কেবলই মনে করি বাড়ী থেকে বেরুব না, ওরা আবার জোর কোরে ধরে নিয়ে যায়।"

সুকুমারী ধীরে ধীরে কহিলেন, "তা একটু আমোদ আহ্লাদ বাড়ীতে কর্‌লেই বা দোষ কি ? তোমার ত বাড়ীতে একটু খেলেই হয়, বাহিরে না হয় রোজ রোজ নাই গেলে।"

গোবিন্দ চন্দ্র ভার্য্যার মুখের দিকে দেখিতে লাগিলেন।

তিনি বাড়ীতে মদ খাইতেন না, বাড়ীতে মদ রাখিতেন না। তাহার একমাত্র কারণ সুকুমারী। তখন গৃহিণী যাহা বলিতেন তাহাই হইত। সুকুমারী জানিতেন মদে সর্ব্বনাশ হয়, এই কারণে তিনি এমন সর্ব্বনাশের উপায় বাড়ীতে আসিতে দেন নাই, এখন তিনি স্বামীকে গৃহে মদ্য পান করিবার জন্য স্বয়ং অনুরোধ করিতেছেন। সুতরাং গোবিন্দ চন্দ্র কিছু বিস্মিত হইলেন।

এ কথা যে সুকুমারী ভাবিয়া দেখেন নাই এমন নহে। তিনি কি ইচ্ছা করিয়া এমন অনুরোধ করিতেছিলেন? তাঁহার কি ইচ্ছা যে স্বামী গৃহে মদ্যপানের অভ্যাস করেন? অনেক ভাবিয়া, অত্যন্ত অনিচ্ছাপূর্ব্বক এই উপায় স্থির করিয়াছিলেন। তাঁহার কথায় স্বামী গৃহে মদ্য পান করিতেন না সত্য, কিন্তু বাহিরে তাঁহাকে কে বারণ করিত? নূতন নূতন স্ত্রীর ভৎর্সনায়, স্ত্রীর অভিমানে তিনি অত্যন্ত লজ্জা পাইতেন কিন্তু সে লজ্জা ত প্রায় ঘুচিয়া আসিয়াছিল। তাই সুকুমারী ভাবিতেছিলেন যে যদি ঘরে মদ থাকে তাহা হইলে হয়ত গোবিন্দচন্দ্র এত বাহিরে যাইবেন না, মদ্যপায়ী বন্ধুদিগের হস্ত হইতে রক্ষা পাইলে পাইতে পারেন। গোবিন্দ চন্দ্র অল্পক্ষণ পরে ভার্য্যার মুখের দিকে না চাহিয়া কিছু অন্যমনস্ক ভাবে মৃদুস্বরে কহিলেন, "রোজ আমার চাই না। তবে কদাচ কখন একটু আধটু হলে বাড়ী থেকে বেরুবার কোন আবশ্যক হয় না।"

সেই দিন হইতে কিছু কাল পর্য্যন্ত ইয়ার মহলে কেহ আর

গোবিন্দচন্দ্রের দেখা পাইত না। দেখা করিতে গেলে হয় বাবুর অসুখ, না হয় বাবু নিদ্রিত। বাড়ীর ভিতরেই একটু করিয়া খাইয়া গোবিন্দচন্দ্র শয়ন করিতেন। কিন্তু এমন করিয়া কয় দিন যায়? তাঁহার যে কেবল পানাসক্তি জন্মিয়াছিল তাহা নহে। দুই এক গ্লাস উদরস্থ হইলে কিছু স্ফূর্ত্তি হইত, মুখে ইংরাজী আসিত, সঙ্গীতজ্ঞ না হইলেও গান গাহিবার ইচ্ছা হইত, রাগরঙ্গইয়ারকির জন্য মনটা কস্ কস্ করিত। মদ খাইয়া যদি আবার চুপ করিয়া অতি শান্ত ভদ্রলোকটির মত থাকিতে হইল তাহা হইলে মদ খাইবার আবশ্যক কি? গোবিন্দ চন্দ্র যেমন কিছু অস্থির হইলেন তাঁহার বন্ধুগণ ততোধিক অধীর হইয়া উঠিলেন। একদিন সন্ধ্যার সময় তাঁহারা দুই চারি জন গোবিন্দচন্দ্রের বৈঠকখানায় আসিয়া বসিয়া দৃঢ় সঙ্কল্প করিলেন যে গোবিন্দ চন্দ্রের সহিত দেখা না করিয়া যাইবেন না। তাঁহাদের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইবার নহে দেখিয়া গোবিন্দ চন্দ্র তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। তাঁহারা সেই দিন বুঝিতে পারিলেন যে গোবিন্দ চন্দ্র বাড়ীতে পানাভ্যাস করিয়াছেন। সেই অবধি গোবিন্দ চন্দ্রের বাড়ীও একটা আড্ডা হইল। দুই চারিজন বন্ধু বৈঠকখানায় জুটিলেই একটা করিয়া বোতল খোলা হয়, খুলিলে কখন এক বিন্দুও অবশিষ্ট থাকে না। সুকুমারী কি বলিবেন, নিজে অনুমতি দিয়াছেন। তাঁহার যে উদ্দেশ্য তাহাও নিষ্ফল হইল। মদ খাইলে গোবিন্দ চন্দ্রের আর ভার্য্যাভয় থাকিত না, বন্ধুদিগের সহিত

বাহিরে চলিয়া যাইতেন। বাহিরে যেমন ছিল তেমনি রহিল, তাহার উপর বাড়ীতে নিত্য উপদ্রব হইতে আরম্ভ হইল। সুকুমারী কত চেষ্টা করিলেন, স্বামীকে কত বুঝাইলেন কিছুতেই কিছু হইল না। পতিপ্রাণা সাধ্বী বড় চিন্তিত ও ভীত হইলেন।

সুকুমারীর পিত্রালয়ে ঈশ্বর চন্দ্র নামে তাঁহার একজন খুল্লতাত ছিলেন। ঈশ্বর চন্দ্র সম্মানের ও যশের সহিত অনেক দিন রাজকর্ম্ম করিয়া কিছু দিন হইল পেন্সন লইয়াছেন। তিনি জ্ঞানী, ধর্ম্মাত্মা ও পণ্ডিত বলিয়া গোবিন্দ চন্দ্র তাঁহাকে অত্যন্ত ভক্তি করিতেন। সুকুমারী গোপনে খুল্লতাতকে সংবাদ পাঠাইয়া দিলেন, আমার বড় বিপদ আপনি একবার শীঘ্র আসুন।

ঈশ্বর চন্দ্র আসিলেন। শুভ্র শ্মশ্রুকেশ, শান্ত সৌম্য মূর্ত্তি। ভ্রাতৃকন্যার নিকট সকল কথা শুনিলেন। নির্জ্জনে গোবিন্দ চন্দ্রকে কহিলেন, "তুমি পণ্ডিত, জ্ঞানবান, অপরকে শিক্ষা দিতে পার, তোমাকে আমি কি বুঝাইব? কিন্তু তোমার মত লোকের নামে কোন কথা উঠিলে শুনিতে ক্লেশকর।"

গোবিন্দ চন্দ্র কহিলেন, "কি শুনিয়াছেন?"

ঈশ্বর চন্দ্র কহিলেন, "তুমি নিজে বুঝিয়া দেখ লজ্জিত হইবার কোন কথা আছে কি না।"

গোবিন্দ চন্দ্র কহিলেন, "আপনি যাহা বলিতেছেন বুঝিতে পারিতেছি। কিন্তু বিশেষ নিন্দার কর্ম্ম কি করিয়াছি?"

ঈশ্বর চন্দ্র কহিলেন, "নিন্দার কর্ম্ম হয়ত কিছুই হয় নাই,

কিন্তু সে ভয় আছে কি না ভাবিয়া দেখ। তোমার মত ব্যক্তি যে কতকগুলা অপদার্থ মাতালের সঙ্গে বেড়ায় ইহাই লজ্জার কথা। কিন্তু আমি বয়সে ও সম্বন্ধে বড় বলিয়া যে তোমাকে কোন পরামর্শ দিতেছি বা আমার কোন কথা স্বীকার করিতে বলিতেছি এমন মনে করিও না। মনে কর কোন সমবয়স্ক বন্ধুর সহিত তুল্যভাবে কথা কহিতেছ।"

গোবিন্দচন্দ্র কহিলেন, "বলুন।"

"শিক্ষিত ও অশিক্ষিত ব্যক্তিতে প্রভেদ কি? যাহারা তোমার সহিত কথা কহিবার উপযুক্ত নয় তাহাদের সঙ্গে মিশিয়া যদি তাহাদের মত আচরণ কর তাহা হইলে তুমিও ত তাহাদের শ্রেণীর লোক হইলে!"

গোবিন্দ পূর্ব্বের অপেক্ষা অকুণ্ঠিত ভাবে কহিলেন, "কেবল শিক্ষাতেই স্বভাবের পরিবর্ত্তন হয় না। মানুষের মনের বল সকলের সমান হয় না। যে দুর্ব্বলচিত্ত, প্রলোভনে পড়িলেই সে পতিত হইবে।"

বর্ষীয়ান ঈশ্বর চন্দ্র কহিলেন, "অন্যান্য উন্নতিও যেমন শিক্ষার লক্ষ্য, চিত্তের বলবত্তাও সেইরূপ শিক্ষার লক্ষ্য। সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হইলেই শিক্ষা সম্পূর্ণ নতুবা অসম্পূর্ণ। যদি আমার এরূপ জ্ঞান হয় যে কোন বিশেষ কর্ম্ম নিষিদ্ধ বা গর্হিত, কিন্তু সেই কর্ম্ম হইতে যদি বিরত হইতে না পারি তাহা হইলে জানিতে হইবে আমার শিক্ষা অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। স্বাভাবিক দুর্ব্বল চিত্ত যে

সবল হয় না সে কথা আমি মানিব না। কোন নূতন গ্রন্থ বা নূতন ভাষা প্রথমে দুরূহ ও দুর্ব্বোধ্য বোধ হয় কিন্তু অভ্যস্ত হইলে বড় সহজ হইয়া যায়। স্মৃতি যেমন অনুশীলনে প্রখরা হয় হৃদয়ের প্রবৃত্তিও শিক্ষা এবং সাধনায় সেইরূপ সংযত ও দৃঢ় হয়।"

গোবিন্দচন্দ্র কহিলেন, "আপনার কথা স্বীকার করি। কিন্তু যে আপনাকে অন্যের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করে তাহার পক্ষেই এরূপ সংযম ও সাধনা সম্ভব। যাহার সে অভিমান নাই, যে সকলকে আপনার সমকক্ষ মনে করে তাহাকে কি বুঝাইবেন?"

ঈশ্বরচন্দ্র। "তুমি কথা কাটাইতেছ। বিদ্যা অথবা পাণ্ডিত্যের অভিমান না করা বিনয়ের লক্ষণ মানি। কিন্তু শিক্ষা পাইয়া যে অধমের তুল্য হইতে হইবে অথবা দুশ্চরিত্রের আচরণ করিতে হইবে এরূপ ধারণা বিনয়ের লক্ষণ মানি না। তাহা হইলে উত্তমে ও অধমে প্রভেদ কি রহিল?"

গোবিন্দচন্দ্র। "কিন্তু পাপ হইতে, অসৎ কর্ম্ম হইতে, বিলাস-পরায়ণতা হইতে নিবৃত্ত হইবার কিছু উদ্দেশ্য থাকে। আমাদিগের কি এমন উদ্দেশ্য আছে যে আমরা ভোগ সুখ হইতে বিরত হইব?"

ঈশ্বর চন্দ্র কিছু বিস্মিত হইয়া গোবিন্দ চন্দ্রের দিকে চাহিলেন। কহিলেন, "উদ্দেশ্য আবার কি? কোন্ উদ্দেশ্যে আমরা বিদ্যালোচনা করি, জ্ঞানার্জ্জন করি? মুটে মজুর যেমন মূর্খ থাকে আমরাও ত ইচ্ছা করিলে সেইরূপ মূর্খ থাকিতে পারি।"

গোবিন্দ চন্দ্র কহিলেন, "আপনি অনুমতি দিয়াছেন সেই জন্য অকপটে যাহা মনে আসিতেছে তাহাই বলিতেছি নহিলে আপনার কথায় উত্তর করিতে আমার সাহস হয় না। বিদ্যা শিক্ষা কতক লোকের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, কেন না সংসারের কিছু কাজে শিক্ষার প্রয়োজন। বাল্যকালে যাহারা বিদ্যাভ্যাস করে তাহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও কৌতূহল হয়, সেই কৌতূহলের বশীভূত হইয়া বিদ্যা ও জ্ঞান সঞ্চয় করে। ভোগলালসাও কতক পরিমাণে কৌতূহলজনিত।"

ঈশ্বরচন্দ্র কহিলেন, "তাহা হইলে কি চরিত্র সংযমনের, সংশোধনের কোন উদ্দেশ্য নাই?"

গোবিন্দ চন্দ্র ক্ষুদ্র নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কিঞ্চিৎ বিষণ্ণভাবে কহিতে লাগিলেন, "অন্য জাতির থাকিতে পারে কিন্তু আমাদের ত কিছুই দেখিতে পাই না। আমাদের দ্বারা কোন্ মহৎ কর্ত্তব্য সাধিত হইতে পারে? আমাদের জীবনে সুখ কি, আমাদের জাতীয় কোন উদ্দেশ্য আছে? পৃথিবীতে যত বড় কাজ, আমাদের সহিত কোনই সম্পর্ক নাই। আদর্শ চরিত্র, আদর্শ জীবনের উদ্দেশ্য এই যে অপর লোকে তাহাই দেখিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে। কিন্তু আমাদের সে পথে কাঁটা, সে দিকে অগ্রসর হইবার উপায় নাই। আপনাদের দেশ, তাহার সহিত কোন সংশ্রব নাই। যে উদ্যমে মনে বল হয়, চিত্ত পবিত্র হয় এমন কিছুই আমাদের নাই। যত দ্রুত অবনতি হয়, যত শীঘ্র

আমাদের জাতি লুপ্ত হয় ততই মঙ্গল।, আমাদের উৎসন্ন যাইবার পথ মুক্ত, আর সব রুদ্ধ।”

ঈশ্বর চন্দ্র কহিলেন, “এমন কথা বলিও না, কখন মনে করিও না। অবস্থা বিশেষে মানুষের উন্নতি ও অবনতি হয়, কিন্তু কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করিলে মানুষের যত্ন কখন বিফল হয় না। পতন হইলেই উত্থান আছে। যতই কেন অবনতি হউক না একান্ত চিত্তে চেষ্টা করিলে উন্নতি আবার নিশ্চয় হইবে। তুমি আমি কি ত্রিকালদর্শী, ভবিষ্যতের গর্ভে কি নিহিত আছে কে বলিতে পারে? এখন যে সকল বিঘ্ন বাধা দুরতিক্রম বোধ হইতেছে কিয়ৎকাল পরে তাহা সমুদায় দূর হইয়া যাইতে পারে। মানুষের বাহুতে, মানুষের মনে, বল আছে কেন? যতই বিপদ উপস্থিত হইবে ততই তাহার .হিত যুঝিতে হইবে। যে কর্ম্ম আমরা না পারি, আমাদের পুত্র পৌত্রগণ সম্পন্ন করিবে। হতাশ হইলে, নিশ্চেষ্ট হইলে কি কোন জাতি আজ পর্য্যন্ত শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারিত? আমাদের যে অবস্থা আর কোন জাতির কি কখন সে অবস্থা হয় নাই? এমন অবস্থায় পতিত হইয়া কখন কোন জাতি কি আবার উন্নত হইতে সমর্থ হয় নাই? বল বর্দ্ধিত হইতে আরম্ভ হইলে ক্রমাগত বর্দ্ধিত হইতে পারে। আর ইহাও স্মরণ করিতে হয় যে পৃথিবীশুদ্ধ মানুষ এক জাতি। আদর্শ কেবল এক জাতির জন্য নহে, সকল জাতির জন্য। কেবল কি জাতির জন্য? নিজের জন্য নহে? তুমি

পরকালে বিশ্বাস কর আর নাই কর, বল দেখি যথেচ্ছ ভোগসুখে যথার্থ সুখ, কি ইন্দ্রিয় ও প্রবৃত্তি দমনে অধিক সুখ? মনুষ্যত্ব ত ইহকালের সামগ্রী, পরকালের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। প্রত্যেক মানুষের কর্ত্তব্য যে সাধ্যমত মনুষ্যত্ব প্রাপ্তির চেষ্টা করিবে। এ কথা কি তুমি অস্বীকার কর?”

গোবিন্দ চন্দ্র মৌন হইয়া রহিলেন, কোন কথা কহিলেন না।

গ্রামে ফিরিয়া যাইবার সময় ঈশ্বর চন্দ্র সুকুমারীকে কহিয়া গেলেন, “মা, তোমার স্বামী পণ্ডিত, বুদ্ধিমান, সব বুঝিতে পারেন, তাঁহাকে আমি কি বুঝাইব, আর কেহই বা কি বুঝাইবে? যদি তোমার আবার কখনও মনকষ্ট হয় তাহা হইলে জগদীশ্বরকে ডাকিও, তিনি তোমার দুঃখ দূর করিবেন।”

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

অনেক বুনিয়াদী ঘরের ছেলে যেমন হয় স্বর্ণময়ীর স্বামীও সেইরূপ। কিছু মূর্খ, কিছু দাম্ভিক, কিছু অলস, কিছু সন্দিগ্ধ, কিছু বিলাসপ্রিয়। নাম কান্তিচন্দ্র। পড়াশুনা কিছুদিন করিতেছিল মন্দ নয়, এমন সময় তাহার মনে বিশ্বাস জন্মিল যে বুনিয়াদী বড় মানুষের ছেলের পক্ষে স্কুল কালেজে অনেক দিন পড়া নিষ্প্রয়োজন। বিশ্বাসও যেমন জন্মিল পড়াও তেমনি ছাড়িল। তাহার পর নানা রকম সঙ্গী জুটিল। বিবাহ যখন হইল তখন স্বর্ণময়ীর বয়স্ তের বৎসর। কান্তিচন্দ্রের বাইশ। বিবাহের পর জামাই সময়ে সময়ে শ্বশুরবাড়ী আইসে। নবোঢ়া কন্যা যেমন প্রথমে লজ্জা করে স্বর্ণময়ী সেই রূপ লজ্জা করে। কখন কখন কান্তিচন্দ্র হেমন্তকুমারকে দেখিতে পাইত। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল হেমন্তকুমার সে বাড়ীর ছেলে নয়। তবে কে? গ্রামসুবাদে আসে যায়। কান্তিচন্দ্রের সম্বন্ধে এক শ্যালা ছিল, সে খবর দিতে বড় মজবুত। কহিল, "উনি স্বর্ণকে পড়াতেন।"

কান্তিচন্দ্র একটু উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এখনও পড়ায়?"

সম্বন্ধী আবার সামলাইল। "কই, উনি নিজের পড়া নিয়ে ব্যস্ত, স্বর্ণকে কি আর কাউকে পড়াতে পার্তেন না। কখন

কদাচ্ ছয় মাসে নয় মাসে এক দিন বলে দিতেন। এখন আর পড়ান না।"

নিশ্বাস একটু চাপিয়া কান্তিচন্দ্র কহিল, "কথাবার্ত্তা হয়?"

সম্বন্ধী বিস্মিত হইল। "কেন, কথাবার্ত্তা কবে না কেন? চিরকাল কথাবার্ত্তা কয়েছে এখন কইবে না কেন?"

"না, তাতে আর দোষ কি! আমি তাই বল্‌ছিলাম," বলিয়া কান্তি কথা ফিরাইল।

কিন্তু সে কথাটা ভুলিয়া গেল না। সেই অবধি তাহার মনে সন্দেহের স্ত্রপাত হইল। রাত্রিকালে স্বর্ণময়ীকে কহিল, "তোমাদের বাড়ী ঐ যে লোকটা আসে ও কে?"

স্বর্ণময়ী তখন অল্প কথা কহিত। জিজ্ঞাসা করিল, "কে?"

"ওই যে হেমন্তকুমার।"

"কেউ নয়। মামীর বাপের বাড়ীর কাছে বাড়ী বলে আসে।"

"কেউ নয় ত ওর সঙ্গে কথা কও কেন?" কান্তিচন্দ্র কিছু রুক্ষস্বরে জিজ্ঞাসা করিল।

স্বর্ণময়ী কহিল, "ছেলে বেলা থেকে কথা কয়ে এসেছি তাই কই।"

"তুমি এখন আর ছেলেমানুষ নও, তোমার বিয়ে হয়েছে। ওর সঙ্গে আর কথা কইতে পাবে না।"

স্বর্ণময়ী কহিল, "শ্বশুরবাড়ী গেলে আর কথা কইব না।"

কান্তি রাগিয়া বলিল, "তোমার কি নিজের মতে হবে? আমি বারণ করচি তুমি আর ওর সঙ্গে কথা কহিও না।"

স্বর্ণময়ী কহিল, "আচ্ছা।"

নিজের দুঃখ নিজে ডাকিয়া না আনিলে আসে না। যদি কান্তিচন্দ্র এরূপ না করিত তাহা হইলে হয়ত কালে স্বর্ণময়ী পূর্ব্বকথা বিস্মৃত হইত। তাহার হৃদয় তখনও কোমল, স্মৃতি ক্ষণস্থায়িনী। স্বামীর স্নেহ বিবাহের পরেই যদি জানিত তাহা হইলে স্বামীর ঘর করিতে করিতে বাল্যস্মৃতি ভুলিয়া যাইত। বাল্যস্বপ্নের ন্যায় সেই বাল্যানুরাগ মিলাইয়া যাইত। অন্ততঃ হেমন্তকুমারকে ভুলিয়া থাকিত। কিন্তু তাহা হইল না। স্বামীর স্নেহশূন্য পরুষ কথায় সেই আর এক দিনকার কথা মনে পড়িল। জ্যোৎস্নাস্পর্শের ন্যায় সেই চুম্বনস্পর্শ মনে পড়িল। সেই মুখ, সেই চক্ষু, সেই নিশ্বাস, সেই সায়ংকাল, সেই সরোবর, সেই সরোবরের জল মনে পড়িল। কথা কহিতে বারণ, মনে করিতে কে বারণ করিবে? নির্ব্বোধ স্বামীর কথায় স্বর্ণময়ীর মন বুঝিল না। মন বলিল, কেন তাহার কথা ভাবিব না? তাহার বিষয় কিছুই জানে না তাহাতেই এত কথা; জানিলে কি করিত! মুখকে বন্ধ করিলে, আমায় বন্ধ করিবে কেমন করিয়া?

তাহার পর একদিন হেমন্তকুমারের সহিত স্বর্ণময়ীর দেখা হইল। আর কেহ ছিল না। হেমন্তকুমার জিজ্ঞাসা করিল, "এখানে আর কত দিন আছ?"

স্বর্ণময়ী চারিদিকে চাহিয়া বলিল, "তোমার সঙ্গে কথা কইতে বারণ।"

হেমন্তকুমারের মাথায় বজ্রপাত হইল। স্তম্ভিত হইয়া কহিল, "কেন? কে বারণ করিল?"

স্বর্ণময়ী কহিল, "কে আর বারণ কর্‌বে?"

হেমন্তকুমার কহিল, "কান্তি?"

স্বর্ণময়ী মুখ নত করিল।

হেমন্তকুমার তখন ধীরে ধীরে, প্রত্যেক কথায় নিজের হৃদয়ে দারুণ আঘাত করিয়া, কহিল, "তবে তুমি আর কথা কহিও না।"

স্বর্ণময়ী হৃদয়কে রোধ করিতে পারিল না। বেগের সহিত কহিল "কেন, সকল কথাই কি শুন্‌তে হবে? শ্বশুরবাড়ী না হয় তোমার সঙ্গে কথা কইব না। এখানে কইব না কেন?"

হেমন্তকুমার কিছু বলিল না, কিন্তু তাহার মুখে তাহার হৃদয়ের পুঞ্জীকৃত প্রেম, হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা, হৃদয়ের আবেগ প্রতিভাত হইল। স্বর্ণময়ী তাহার মুখে সেই সমস্ত হস্তস্থিত লিপির ন্যায় পাঠ করিল।

কান্তিচন্দ্র যখন আসিত তখনই সেই কথা পাড়িত। হেমন্তকুমারের সাক্ষাতে স্বর্ণময়ী এখন বাহির হয় কি না, তাহার সঙ্গে কথা কয় কি না। স্বর্ণময়ী মিথ্যা কথা বলিত। সে বড় একটা হেমন্তকুমারের সাক্ষাতে আসিত না, আর কেহ থাকিলে বড় একটা কথাও কহিত না। কিন্তু একেবারে দেখাও বন্ধ করিল না, কথাও বন্ধ করিল না। স্বামীর কাছে কিন্তু স্বীকার করিত না। পূর্ব্বে একটা গোপনীয় কথা ছিল তাহার পর গুপ্ত কথার

সংখ্যা বাড়িল। সব কথা গুলা জড় করিলেও যে একটা বিশেষ গোপনীয় কথা হয় এমন নয়, কিন্তু যে কথাটা হৃদয়ের স্বচ্ছ সলিলে ভাসিয়া বেড়াইতেছিল সেই কথাটা একটু ডুবিতে লাগিল। কান্তিচন্দ্র খোঁচা দিয়া কথাটাকে ডুবাইত। যে কথাটার একেবারে মূল নাই মনে করিয়া কান্তিচন্দ্র স্বর্ণময়ীর স্মৃতি হইতে উৎপাটন করিবার চেষ্টা করিতেছিল সেই কথার মূল স্মৃতি হইতে সরিয়া স্বর্ণময়ীর হৃদয়ে গেল। সেই মূল ক্রমে নিম্নগামী ও দৃঢ় হইতে লাগিল। হেমন্তকুমারের ছায়া কান্তিচন্দ্রের অন্ধকার কটাক্ষে আরও গাঢ় হইতে লাগিল। তাহার মূর্ত্তি কান্তিচন্দ্রের বাক্যসংঘর্ষে আরও উজ্জ্বল হইতে লাগিল।

স্বর্ণের শ্বশুরবাড়ী যাইবার সময় আসিল। হেমন্তকুমারের সহিত একবার এক মুহূর্ত্ত কালের জন্য গোপনে দেখা হইল। দুই জনের চক্ষে দুই জনের মনের কথা জ্বলিতেছিল, মুখে অধিক কথা কহিতে পারিতেছিল না। গমন কালে একবার হেমন্ত-কুমার স্বর্ণময়ীর হস্ত স্পর্শ করিয়া ছাড়িয়া দিল। কহিলে, "স্বর্ণ!"

স্বর্ণ একবার ঈষৎ কটাক্ষ তুলিল।

"যদি কখন কোন দুঃখ হয় ত আমায় মনে করিও। আমায় বলিও।"

স্বর্ণ ধীরে কহিল, "বল্‌ব।"

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

ইদানী শ্যামার অন্তরে গরলে তেমন আর তীব্র বিষ ছিল না। পরের নিন্দা আর তত ভাল লাগিত না, তাহার অপেক্ষা অন্য কথা ভাল লাগিত। বিষাক্ত বাক্যের হুল সর্ব্বদা সকলকে ফুটাইত না। তাহার মুখে একটু খানি হাসি লাগিয়া থাকিত। চক্ষু অল্প আর্দ্র, কটাক্ষে একটু আলস্য; কিছু অন্যমনস্ক, একেলা থাকিলে অতি মৃদু মৃদু আপনা আপনি গান করে। পিসিমা যদি সে গান স্পষ্ট শুনিতে পাইতেন তাহা হইলে যে কি করিতেন কল্পনা করিতেও ভয় হয়। কোন্দল আর শ্যামার ভাল লাগিত না, বরং কাণে খারাপ লাগিত। নিরবচ্ছিন্ন মৃদু মৃদু মধ্যাহ্ন ভ্রমরগুঞ্জনের ন্যায় প্রেমের কথা তাহার ভাল লাগিত। কেহ ঝগড়ার কথা কহিলে সেই শ্যামা চুপ করিয়া থাকিত, একটু হাসিত কিম্বা উঠিয়া যাইত। শ্যামা যেন এক রকম হইয়া গিয়াছিল। পিসিমা ত কিছুই বুঝিতে পারিতেন না, কিন্তু ভাল মন্দ যাহাই হউক একটা না বুঝিয়া তিনিও ক্ষান্ত হইবার লোক নহেন।

শ্যামা প্রায় সর্ব্বদাই মুক্তর কাছে থাকে। শ্যামাচরণও আপিসে যান আর শ্যামাও গিয়া পাশের বাড়ীতে উপস্থিত হয়।

চারুবালা ও আর সকলের ইচ্ছা মুক্তকে ডাকিয়া তাহার সঙ্গে তাস খেলে, গল্প করে, কিন্তু শ্যামা মুক্তকে একচেটীয়া করিয়া লইয়াছিল। এ বাড়ীতে তাহাকে বড় আসিতে দিত না। দুই জনে সমস্ত দিন যে কি করিত তাহারাই জানিত।

কিন্তু অধিক দিন এমন করিয়া গেল না। একদিন পিসিমা শ্যামাকে একেলা পাইয়া কহিলেন, "হ্যাঁলা শ্যামা, এ তোর কেমন আক্কেল?"

শ্যামা যেন কিছুই জানে না। "আমার আবার কেমন আক্কেল?"

পিসিমা কহিলেন, "পোড়া কপাল তোমার! পাশের বাড়ী গিয়ে নিত্য কি করিস্? মুক্তর সোমত্ত ভাই ঘরে থাকে তার সঙ্গে না কি গান গাওয়া হয়! পাড়ার লোকে সব কি বল্‌চে শুনে কাণে হাত দিতে হয়। নিজের গালে কি নিজে চূণকালি মাখ্‌বি না কি?"

শ্যামার চক্ষে বক্ষে যেন কণ্টক বিদ্ধ হইল। যেন তাহার মেরুদণ্ড ধরিয়া কে সবলে আকর্ষণ করিল, তাহার সমস্ত শরীর ঝন্ ঝন্ করিয়া উঠিল। লোকে এমন কথা বলিতেছিল শ্যামা ত তাহার কিছু জানিত না! কথাটা মিথ্যা, কিন্তু, একেবারে অমূলক কি? যখন বৈকুণ্ঠ বড় গায়ে পড়িত তখন শ্যামা সরিয়া বসিত কেন, তখন তাহার মনে কি আশঙ্কা হইত? তাহার শরীরে, মনে এ পরিবর্ত্তন কেমন করিয়া ঘটিয়াছিল? তাহার

শরীরের ভিতরে সুখালস্যের তরঙ্গ সর্ব্বদা উঠিত কেন? দূরে যে আশঙ্কা অস্পষ্ট ছায়ার মত ভাসিয়া বেড়াইতেছিল আজ পিসিমার কথায় সেই আশঙ্কা মূর্ত্তিমতী হইয়া শ্যামার সম্মুখে উপস্থিত হইল। শ্যামা স্থির ভাবে সেই ভয়ের মূর্ত্তি চাহিয়া দেখিল।

নিমেষের মধ্যে এই সকল কথা শ্যামার মনে হইল, কিন্তু পিসিমার কথার উত্তর দিতে বিলম্ব হইল না। অতি মধুরস্বরে কহিল, "আমি মাখি আর না মাখি তুমি ত মাখিয়েছ? পিসিমার উপযুক্তই কাজ হয়েচে।"

পিসিমা কহিলেন, "লজ্জার মাথা কি এরি মধ্যে খেয়েছিস্? লোকে না বল্‌লে আমি এ সব কথা কোথা থেকে শুন্‌তে পাব!"

শ্যামা কহিল, "তুমিই কেবল শুন্‌তে পাও, আর ত কেউ শুন্‌তে পায় না। আচ্ছা পিসিমা, তোমার নামে কি কখন কেউ কিছু বলে নি, তুমি কি চিরকাল এই রকম কয়খানা হাড় ছিলে?"

পিসিমার একেবারে বাক্‌রোধ। অবশেষে চীৎকার করিয়া কহিলেন, "পোড়াকপালী, হতভাগী, নচ্ছার ছুঁড়ি! এত বড় তোর আস্পর্দ্ধা! যত বড় মুখ তত বড় কথা!"

শ্যামা আর কোন কথা কহিল না, একটু হাসিয়া চলিয়া গেল।

মুক্তকেশীকে লইয়া শ্যামাচরণ কিছু বিপদে পড়িয়াছিলেন। মুক্ত হাসি তামাসার বড় বাড়াবাড়ি করিতেছিল। শ্যামাচরণ কিছু বুঝিয়া উঠিতে পারিতেন না। পাশের বাড়ীতেও আগের মত

বেশী যাওয়া আসা ছিল না, তবে মুক্তর এত বাড়াবাড়ি কেন? শ্যামা প্রায় প্রত্যহ আসিত শ্যামাচরণ সে সংবাদ রাখিতেন, কিন্তু শ্যামা বিধবা মানুষ, তাহার সহিত মুক্তর কি এত হাসি তামাসার কথা হইতে পারে? ভিতরে কি একটা রহস্য আছে জানিবার জন্য শ্যামাচরণ অত্যন্ত উৎসুক হইলেন।

একদিন শ্যামাচরণ কুঠী হইতে কিছু সকাল সকাল ফিরিয়া আসিলেন। উপরে কণ্ঠশব্দ শুনিতে পাইয়া পা টিপিয়া টিপিয়া সিঁড়ীতে উঠিলেন। তাঁহার শয়ন গৃহ হইতেই শব্দ আসিতেছে। দ্বার ভেজান ছিল। শ্যামাচরণ পূর্ব্বের মত পা টিপিয়া টিপিয়া দরজা গোড়ায় গিয়া দাঁড়াইলেন।

বৈকুণ্ঠ মৃদুস্বরে গান করিতেছিল। তাহার স্বর কম্পিত হইতেছিল। গান শুনিতে শুনিতে শ্যামাচরণের নিশ্বাস রুদ্ধ হইল। গান কদর্য্য, কুৎসিত আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ, অশ্রাব্য। শ্যামাচরণ ধীরে ধীরে দ্বার ঈষৎ মুক্ত করিলেন। যাহা দেখিলেন তাহাতে স্তম্ভিত হইলেন।

শ্যামা শয্যায় শয়ন করিয়াছিল। বৈকুণ্ঠ শয্যায় উপবেশন করিয়া শ্যামার মুখের দিকে চাহিয়া গান করিতেছিল। শ্যামার চক্ষু অর্দ্ধমুদ্রিত, কখন বৈকুণ্ঠের প্রতি কটাক্ষপাত করিতেছিল, কখন অন্যদিকে চাহিতেছিল। মুক্ত সে ঘরে ছিল না।

শ্যামাচরণকে দেখিয়া কে কোন্ দিকে যাইবে ভাবিয়া পায় না। বৈকুণ্ঠ উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার মুখ শুকাইয়া গেল। শ্যামা

মাথায় কাপড় টানিয়া উঠিয়া বসিল। পদতলে ধরণী দ্বিধা বিদীর্ণ হইলে সে নিশ্চয় তৎক্ষণাৎ তাহার মধ্যে প্রবেশ করিত।

সে সময় শ্যামাচরণ আর কিছু না বলিয়া সরিয়া গেলেন। কিন্তু রাত্রে তুমুল কাণ্ড বাধিল। শ্যামাচরণ যাহা মুখে আসিল তাহাই বলিয়া মুক্তকে গালি দিলেন। কহিলেন, "সকল ব্যবসাই হয়েছে কেবল কুট্‌নীপনা বাকি ছিল। এখন তাও আরম্ভ হয়েচে।"

মুক্ত প্রথমে কিছু বুঝিতে পারে না। রাগিয়া কহিল, "দিন দিন কি তোমার বুদ্ধি সুদ্ধি লোপ পাচ্চে না কি?"

"তা না হলে আর তোমার মত পাপিয়সীকে ঘরে স্থান দিই? বুদ্ধি থাক্‌লে এতদিন কবে তোমায় বিদায় কোরে দিতেম।"

মুক্ত কহিল, "তা বিদায় কোর্‌তে হবে কেন, বিদায় কর্‌বার আগেই আমি মানে মানে যাচ্ছি। কাল্‌কেই যদি আমায় না পাঠিয়ে দাও ত দিব্য আছে।"

কোথায় নরম হইবে, নিজেকে দোষী জানিয়া লজ্জিত শঙ্কিত হইবে, না মুক্ত সমান উত্তর করিতে লাগিল। শ্যামাচরণ রাগের মুখে কহিলেন, "কাল কেন, আজই দূর হয়ে যাও। তুমি যেখানে যাবে সেখানে পাঠাতে হবে না, পথ আপনি চিনে নেবে।"

আর কোন উত্তর না করিয়া মুক্ত নীচে যাইতে উদ্যত হইল। শ্যামাচরণ দ্বার রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইলেন। কহিলেন, "তোমার নিজের লজ্জা নাই বলে কি অপরকেও সেই রকম কোর্‌তে চাও?"

মুক্ত কহিল, "পথ ছাড়। আমায় যেতে বলেচ যেতে দাও।"

শ্যামাচরণ কহিলেন, "কোথায় যাবে?"

"নীচে। এক গাছা দড়ী না জোটে গঙ্গায় জল আছে।"

"সেখানে যাবার আগে একবার শ্যামা দিদির কাছে যাবে না?"

মুক্ত একটু চমকিয়া উঠিল। আসল কথাটার আভাস তাহার মনে আকাশপ্রান্তে ক্ষীণ বিদ্যুতের মত একবার চমকিয়া গেল। কহিল, "শ্যামা আমার কে? তার সঙ্গে দেখা কোর্‌তে গেলাম কেন?"

শ্যামাচরণ তীব্র ব্যঙ্গস্বরে কহিলেন, "তুমি গেলে তার আর তোমার আদুরে ভাইয়ের কেমন কোরে দেখা শুনা হবে তার একটা বন্দোবস্ত কোরে যাবে না?"

তখন বিস্মিত হইয়া মুক্ত কহিল, "তুমি কি বল্‌চ আমি কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌চি নে।"

"তা পার্‌বে কেন? তোমার সাদা সরল মন কিছু মন্দ দেখ না, কিছুতে মন্দ মনে কর না।"

মুক্ত কহিল, "তোমার মত মন্দ মন আমি কখনও কারুর দেখি নাই। বৈকুণ্ঠ ঐ টুকু ছেলে তার উপর সন্দেহ!"

শ্যামাচরণ কহিলেন, "ভারি অন্যায় আমার! আমি আর সন্দেহ কোর্‌ব না, তুমি দুপুর বেলা রোজ নিজের ঘর খালি কোরে দিও, তা হলে কেউ আর সন্দেহ কোর্‌বে না।"

কথাটা শুনিয়া মুক্তর একটু ভয় হইল। কহিল, "তুমি কি দেখেছ শুনেছ ভগবান জানেন, কিন্তু আমি কিছু জানি নে।"

ক্রমে সকল কথা হইল। শ্যামাচরণ যাহা শুনিয়াছিলেন ও দেখিয়াছিলেন, বলিলেন। মুক্ত শুনিয়া কাণে হাত দিল, কহিল, "সর্ব্বনাশ! আমি এর বিন্দু বিসর্গও জানি নে। তা আমার অপরাধ হয়েছে। দূর হয়ে যেতে বলেছ, দূর হয়ে যাই।" বলিয়া মুক্ত—সময় বুঝিয়া—কণ্ঠ রুদ্ধ করিল, চোকের কোলে আঁচল তুলিল, অশ্রুর ফোয়ারা খুলিয়া দিল। শ্যামাচরণ অভ্যাসমত গলিতে আরম্ভ করিলেন।

অনেক কথাবার্ত্তা পরামর্শের পর স্থির হইল যে বৈকুণ্ঠকে কলিকাতায় রাখা যুক্তিসিদ্ধ নহে, তাহাকে গ্রামে পাঠাইয়া দেওয়াই শ্রেয়।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ ।

"কখন যাও নি ?"

"কখন না ।"

"কখন খাও নি ?"

"কখন না ।"

প্রশ্নকর্ত্তা রমানাথ, উত্তরকারী রজনীকান্ত। রজনীকান্তের অজ্ঞতায় রমাকান্ত অতিশয় বিস্মিত হইয়াছিল। সহরে বাড়ী অথচ রজনীকান্ত কখন হোটেলে যায় নাই, কখন হোটেলে খায় নাই ! রজনীকান্ত লজ্জায় অধোবদন কিন্তু সাহস করিয়া মিথ্যা কথা বলিতে পারিতেছিল না। রমাকান্তের সাক্ষাতে সে কথায় কথায় লজ্জা পাইত। রমাকান্ত ইহারই মধ্যে এত দেখিয়াছে শুনিয়াছে, কিন্তু রজনীকান্ত কিছুই জানে না !

রমাকান্ত কহিল, "তোমায় দেখে কেউ বিশ্বাস কোর্‌বে না যে তুমি সহুরে ছেলে।" ক্ষণকাল পরে ঈষৎ কৃপার্দ্র স্বরে কহিল, "আচ্ছা চল, আজ যাওয়া যাক্।"

রজনীকান্ত প্রথম পিছাইল। "যদি কেউ টের পায় ?"

অন্য ক্ষমতার মধ্যে রমাকান্তের কথা উড়াইয়া দিবার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। "টের পায় তা হলে মাথা নেবে !

আজ পর্য্যন্ত ত কেউ হোটেলে ঢোকে নি, তুমি আজ প্রথম ঢুক্‌বে সেইজন্য নহবত্‌ বসেছে। তুমি যেই পদার্পণ কোর্‌বে অমনি নহবত্‌ বেজে উঠ্‌বে।”

রজনীকান্ত মাটী হইয়া গেল। কিছুক্ষণ ভাবিয়া চিন্তিয়া আর একটা আপত্তি খুঁজিয়া পাইল। কহিল, “আমার কাছে টাকা নেই।”

রমাকান্ত কহিল, “হাঁ, এ কথা তবু একবার মানি। তোমার কাছে টাকা নেই আমার কাছে আছে, অতএব সে ভাবনা ভাব্‌বার বিশেষ আবশ্যক নেই। তুমি আমার সঙ্গে এস।”

অগত্যা রজনীকান্ত তাহার সঙ্গে চলিল। যাইতে যে তেমন অনিচ্ছা ছিল তাহা নহে কিন্তু সকল নিষিদ্ধ কর্ম্ম করিতে প্রথম বার যেমন একটু আশঙ্কা হয়, রজনীকান্তের সেইরূপ একটু আশঙ্কা হইতেছিল। রমাকান্ত একটা ভাল হোটেলে প্রবেশ করিল। সে বলিত, “হেঁজিপেঁজি জায়গায় যাওয়া কিছু নয়, টাকাও খরচ হয় খেতেও পাওয়া যায় না।” দুই জনে একটা ছোট কামরা ও একটি ছোট টেবিল দখল করিল। আহারের আয়োজন হইতেছে এমন সময় রমানাথ উঠিয়া গিয়া খানসামাকে চুপি চুপি একটা কথা বলিল।

রজনীকান্ত জিজ্ঞাসা করিল, “কি বল্‌লে?”

“নহবত্‌ বাজাতে বল্‌লাম।”

“তামাসা নয়, সত্য কথা বল না।”

রমাকান্ত কহিল, "খাবার একটু শীঘ্র আন্‌তে বল্‌লাম।"

খাবার আসিল। রজনীকান্ত ছুরী কাঁটা চালাইতে জানে না, রমাকান্তের দেখিয়া দেখিয়া সাধ্যমত চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই ভাল পারিল না। রমাকান্ত কহিল, "হাত দিয়ে আরম্ভ কর না, লজ্জা কি?" কিন্তু তাহাতে রজনীকান্ত কিছুতেই সম্মত হইল না। ছুরী কাঁটা না ধরিলে হোটেলে খাইবার সুখ কি রহিল?

আহার আরম্ভ হইতেই একজন খানসামা একটী বোতল লইয়া আসিল। রজনীকান্ত জিজ্ঞাসা করিল, "কি এ?"

"শ্যাম্পেন।"

নাম শুনিয়াছিল অনেক দিন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত রজনীকান্ত চক্ষে শ্যাম্পেন দেখে নাই। আজ প্রথম সাক্ষাৎকার লাভ হইল। রজনীকান্ত আগ্রহ ও কৌতূহলের সহিত শ্যাম্পেনসুন্দরীর দীর্ঘ কৃশ গ্রীবা, লোহিত লাক্ষা মুদ্রিত মুখ দর্শন করিল। কিন্তু দর্শন ব্যতীত স্পর্শনে তাহার সাহস হইল না। ভীত হইয়া কহিল, "আমি কখন খাব না।"

রমানাথ কহিল, "তুমি না খাও আমি একাই খাব।"

কিন্তু খাইবার সময় রমাকান্ত দুই গ্লাসে ঢালিল। রজনীকান্তের গ্লাসে কিছু অল্প নিজের গ্লাসে কিছু বেশী। রজনীকান্ত কহিল, "আমি খাইব না, তুমি মিথ্যা কেন ঢালিতেছ?"

রমাকান্ত কহিল, "দু জনে এক সঙ্গে বসেছি তুমি আমার হেল্‌থ্‌ পান কোর্‌বে না?"

রজনীকান্ত কহিল, "না ভাই, কখন খাই নি, হয়ত নেশা হবে। মুখে গন্ধ হবে, বাড়ী গেলে সকলে টের পাবে।"

রমাকান্ত কহিল, "কোন ভয় নেই, আমি সঙ্গে আছি। এতে বেশী মুখে গন্ধ হয় না। বাড়ীতে গিয়ে গল্প না কোরে শুয়ে পড়্‌লেই হবে।"

অনেক পীড়াপীড়িতে রজনীকান্ত একটু খাইল। আহার শেষ হইবার পূর্ব্বে রমাকান্ত জোর করিয়া আর একটু তাহাকে খাওয়াইল। টেবিল হইতে যখন দুইজন উঠিল তখন যেন সে রজনীকান্ত আর নাই। মনের সঙ্কোচ আশঙ্কা দূর হইয়া গিয়াছিল; শরীর ও চিত্ত স্ফূর্ত্তিপূর্ণ বোধ হইতে লাগিল, সর্ব্বাঙ্গে যেন আনন্দের তরঙ্গ উঠিতে লাগিল।

রমাকান্ত উঠিয়া কহিল, "চল, একটু বেড়াতে যাওয়া যাক্।"

রজনীকান্ত কহিল, "কোথা?"

"গাড়ী কোরে একটু এদিক ওদিক ঘোরা যাক্।"

"চল।"

গাড়ী ভাড়া করিয়া দুইজনে বাহির হইল। রাত্রি প্রায় নয়টা হইয়াছে। কিছুক্ষণ ঘুরিয়া গাড়ী একটা গৃহের সম্মুখে দাঁড়াইল। রজনীকান্তের অল্প চিত্তবিকৃতি জন্মিয়াছিল, জিজ্ঞাসা করিল, "এ আবার কোথায়?"

"আঃ এস না," বলিয়া রমাকান্ত তাহার হাত ধরিয়া, গাড়ী

হইতে নামাইয়া সিঁড়ীতে তুলিল। রজনীকান্ত মৃদু মৃদু জিজ্ঞাসা করিল, "এখানে আবার কেন?"

রমানাথ সেইরূপ মৃদু মৃদু কহিল, "তোমায় আবার দেখ্‌তে চেয়েচে। তোমার চোকের বড় সুখ্যাতি করে।"

সিঁড়ীতে এবং সিঁড়ীর উপর আলোক জ্বলিতেছিল। উপরে গৃহদ্বারে আতর দাঁড়াইয়াছিল। রমানাথ ও রজনীকান্তকে দেখিয়া আদর করিয়া বসাইল। রজনীকান্ত কিছু লজ্জিত ও সঙ্কুচিত হইয়া বসিল।

প্রথম সম্ভাষণের পর রমানাথ জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, আতর, তোমার আসল নামটি কি বল দেখি?"

আতর কহিল, "অবাক্! নামও কি আবার নকল আসল হয় না কি?"

রমানাথ কহিল, "হয় না? পোশাকি আটপৌরে নাম হয় না? তোমার অমন ভুর্‌ভুরে গন্ধমাখা নামটী যে তোমার ছেলে-বেলাকার নাম এ ত আমার কখন বিশ্বাস হয় না। আমি শুনেছি তোমার নাম জগদম্বা না হিড়িম্বা কি একটা ছিল।"

আতর হাসিয়া মুখে কাপড় দিল। কহিল, "তোমার বাবু সব বেআকার! তা তোমায় ত কথায় পার্‌বার যো নেই।"

তাহার পর আতর পান লইয়া আসিল। রজনীকান্তের সম্মুখে পানবাটা রাখিয়া কহিল, "বাবু সে দিন পান খান নি। আজও কি খাবেন না?"

রজনীকান্ত কিছু না বলিয়া একটা পান লইয়া খাইল। তামাকু আসিলে তামাকুও খাইল। মধ্যে মধ্যে অলক্ষিতভাবে আতরকে চাহিয়া দেখিতেছিল।

রজনীকান্তের সম্মুখে বিক্রম ও উর্ব্বশীর একখানি ছবি ছিল। রজনীকান্ত কিছুক্ষণ সেই ছবির দিকে চাহিয়া রহিল। ফিরিয়া দেখে রমানাথ তাহার পার্শ্বে নাই। অমনি ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, জিজ্ঞাসা করিল "রমানাথ কোথায় গেল?"

আতর রজনীকান্তের পশ্চাতে দাঁড়াইয়াছিল, রজনীকান্ত তাহা দেখিতে পায় নাই। উঠিতে গিয়া অঙ্গে অঙ্গ স্পর্শ হইল। আতর কহিল, "বাহিরে গিয়েছে, এখনি আস্‌বে।"

রজনীকান্ত কহিল, "না আমি যাই, রমানাথকে ডেকে নেব। অনেক রাত হয়েছে।" বলিয়া, ফিরিয়া গমন করিতে উদ্যত হইল।

আতর অত্যন্ত ধীরে, অতিশয় ভীরুভাবে, রজনীকান্তের হস্ত ধারণ করিল। অতি মৃদু, কোমল, কম্পিত স্বরে কহিল, "একটু দাঁড়াও, একবার তোমায় দেখি।"

রজনীকান্তের শরীর কণ্টকিত হইল, মাথা ঘুরিয়া গেল। আতরের নিশ্বাস তাহার মুখে লাগিতেছিল, আতরের বস্ত্র তাহার বস্ত্রে মিশিতেছিল, উভয়ের মিলিত হস্ত ঈষৎ কম্পিত হইতেছিল।

গৃহে বিকীর্ণ পুষ্প ও পুষ্পমালার সুগন্ধ, গৃহস্থিত শুভ্র আলোক, বাহিরে অন্ধকার, দূরে আকাশখণ্ডে চঞ্চলরশ্মি নক্ষত্র। রজনীকান্ত কিছু দেখিল না, কিছু জানিল না, মন্ত্রমুগ্ধের মত দণ্ডায়মান রহিল। ধীরে ধীরে আতর তাহার হস্ত ত্যাগ করিয়া তাহার কণ্ঠ ধারণ করিল, ধীরে ধীরে তাহার কণ্ঠলগ্ন হইয়া তাহাকে চুম্বন করিল, ধীরে ক্ষুদ্র নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল, "তোমায় কত ভালবাসি!"

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

এক জাতীয় বৃহৎ সর্প আছে, যাহাকে ধরে তাহার আর নিস্তার নাই। জড়াইয়া জড়াইয়া, পাকাইয়া পাকাইয়া চাপিতে থাকে, যে হতভাগ্য প্রাণী সে ভীষণ বন্ধনে পতিত হয় তাহার শ্বাস রুদ্ধ হয়, অস্থি পঞ্জর চূর্ণ হইয়া যায়, অবশেষে প্রাণত্যাগ হয়। তখন সেই সর্প সেই প্রাণীর দেহে নিজ মুখনিঃসৃত লালা মাখাইয়া, মৃত দেহ মসৃণ করিয়া তাহাকে গ্রাস করে। আতরের কোমল, সুখস্পর্শ আলিঙ্গন রজনীকান্তের পক্ষে সেইরূপ সর্পবন্ধনতুল্য হইল। কিন্তু জীবন রহিল। আর সকলি গেল— লজ্জা, শঙ্কা, মানাপমান জ্ঞান, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সব গেল—জীবন অবশিষ্ট রহিল কেন? তাহার সেই সময় মৃত্যু হইলেই ভাল ছিল। তাহার হৃদয়ের বল চূর্ণ হইয়া গেল, সংযমের বন্ধন টুটিয়া গেল, প্রীতিপ্রেমপবিত্রতার আকর্ষণ নিরাকৃত হইল—তখন রজনীকান্ত মরিল না কেন?

আতরের সেই বাহুবন্ধনে রজনীকান্ত আপাদমস্তক আবদ্ধ হইল। প্রণয়ের বন্ধন কেমন, সে যেন কখন জানিতে পারে নাই, সেই রাত্রে প্রথম জানিল। উৎকৃষ্ট মদিরার সঙ্গে তাহার দেহে আর এক নূতন মাদকতা প্রবেশ করিল। কিশোরী ভার্য্যার সঙ্কীর্ণ,

সঙ্কুচিত প্রেম পুংশ্চলীর উৎকট আসক্তিতে বিলুপ্ত হইল। আতরের কটাক্ষে রজনীকান্তের শরীরে রোমাঞ্চ হয়, ইঙ্গিতমাত্রে আতরের দ্বারে উপনীত হয়। ঘৃতাহুত লালসাগ্নি যুবকের নবীন যৌবনে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, সে হাস্যমুখে সেই অগ্নিতে লজ্জা, সম্ভ্রম, সমাজভয়, অর্থ নিক্ষেপ করিতে লাগিল, হাস্যমুখে সেই অনলে আপনার জীবনযৌবন আহুতি দিল।

এমন কথা কয়দিন ঢাকা থাকিতে পারে? প্রথমে দীনবন্ধুর কর্ণে কথা উঠিল না, কিন্তু ছেলের রকম সকম দেখিয়া গৃহিণীর মনে একটু সন্দেহ হইল। তিনি জীবনের মধ্যে প্রথমবার কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম না করিয়া নিজের ইচ্ছামত কর্ম্ম করিলেন। পুত্রবধূকে বাপের বাড়ী হইতে আনাইলেন।

বধূ আসিয়াছে শুনিয়া কর্ত্তা বিস্মিত হইলেন। তিনি ত ইহার কিছু জানেন না! গৃহিণীর তলব হইল। কর্ত্তা মুখ অন্ধকার করিয়া কহিলেন, "আমাকে না বলিয়াই বউকে আনা হল?"

গৃহিণী কহিলেন, "সকল কথাই কি পুরুষমানুষদের বলে কোর্‌তে হয়?"

দীনবন্ধু কহিলেন, "আমার বাড়ীতে আমাকে না জিজ্ঞাসা করিয়া কেহ কিছু করে না।"

গৃহিণী জানিতেন যাহা তিনি করিয়াছেন ভালই করিয়াছেন, এ জন্য আজ তাঁহার একটু সাহস হইল। একটু কোন্দলের ভাবে কহিলেন, "বাড়ী তোমার, আমার নয় তা জানি। কিন্তু

বিপদে বালিকাও বর্ষীয়সীর ন্যায় বুদ্ধিমতী হয়। চারুবালা বয়সে বালিকা কিন্তু সে বুঝিতে পারিল যে স্ত্রীলোকের দুই বিপদের মত আর তৃতীয় বিপদ নাই। প্রথম, বৈধব্য; দ্বিতীয়, স্বামীর স্নেহক্ষয়। কেন এমন হইল? কে শত্রুতা করিয়া তাহার সুখ সাধের বিরোধী হইল, কে স্বামীর প্রণয়ে তাহাকে বঞ্চিত করিতে উদ্যত হইল? পূর্ব্ব জন্মে কি চারুবালা কাহাকেও কোন ক্লেশ দিয়াছিল? তাহাই হইবে। নহিলে এমন সময় তাহার কপাল ভাঙ্গিল কেন? দুঃখের লেশমাত্র তাহাকে এ পর্য্যন্ত স্পর্শ করে নাই, এখন যেন এক নিমেষের মধ্যে সমস্ত সুখ অপসারিত করিয়া দুঃখই তাহার জীবনের সঙ্গী হইল। কাহাকে বলিবে, কে তাহার দলিত হৃদয় ধূলি হইতে উঠাইয়া লইবে? স্নেহসিঞ্চনে কে তাহার মৃতকল্প প্রাণ পুনর্জীবিত করিবে?

যে উপায় ছিল চারুবালা সেই উপায় অবলম্বন করিল। হৃদয়ের বেদনা গোপনে রাখিয়া, চক্ষুভেদী অশ্রু লুকাইয়া, স্বামীকে কহিল, "আমি কি অপরাধ কোরেছি যে তুমি আমায় আগের মত ভাল বাস না?"

রজনীকান্ত স্ত্রীর মুখের দিকে না চাহিয়া কহিল, "তুমি কোন অপরাধ কর নি। আর আমি তোমায় আগের মত ভালবাসিনে এ কথা তোমায় কে বল্‌লে?"

চারুবালা কহিল, "এ কথা কি আর কেউ বল্‌লে আমি বিশ্বাস কর্‌তাম? তোমার ব্যবহারে নিজেই বুঝ্‌তে পার্‌চি।"

রজনীকান্ত কহিল, "আমার ব্যবহারে কি ক্রটী দেখ্‌লে ?"

"তা আমি বল্‌তে পারি নে। তুমি আমায় মন্দ কথাও বল না, অপমানও কর না, দূর ছাইও কর না। কিন্তু আগের মত ভালবাসাও নেই। তুমি গালাগালি দিলে অত কষ্ট হয় না, কিন্তু তুমি যে আগের মত আমায় আর দেখ না তাইতে আমার বড় কষ্ট হয়।"

রজনীকান্ত কিছু বিরক্ত হইয়া কহিল, "তুমি ছেলেমানুষের মত কি সব মনে কর, আমি আর তোমায় কত বোঝাব! তবু যদি সত্য কিছু হত!"

চারুবালা আর কোন কথা কহিল না। নির্জ্জনে, নীরবে দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ের বেদনায় রোদন করিল।

কিন্তু তাহার দুঃখ বাড়িতেই থাকিল। রজনীকান্ত দিন দিন আরও জ্ঞানশূন্য হইতে লাগিল। প্রতিদিন বাড়ী আসিতে অধিক রাত্রি হইলে নানা লোকে নানা কথা বলে, চারুবালা আসিয়া অবধি সমস্ত রাত্রি আর কোথাও থাকা যায় না, এই সকল বিঘ্ন দেখিয়া সে এক নূতন উপায় উদ্ভাবিত করিল। সন্ধ্যার সময় আহার করিয়া শয়ন করিতে যায়। সকলে আহার করিয়া শয়ন করিলে ও চারুবালা নিদ্রিত হইলে আস্তে আস্তে উঠিয়া যায়। চারুবালার নিদ্রাভঙ্গ হইবার পূর্ব্বে ফিরিয়া আসে। চারুবালা সকল রাত্রে নিদ্রিত থাকে না, কিন্তু সাহস করিয়া কিছু বলিতেও পারে না।

এক রাত্রে চারুবালা নিদ্রিত হইয়াছে মনে করিয়া রজনী-কান্ত নিঃশব্দে উঠিয়া কাপড় পরিয়া বাহিরে যাইবার উপক্রম করিতেছে এমন সময় চারুবালা শয্যায় উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাচ্ছ ?"

হাতেলোতে ধরা পড়িয়া থতমত খাইয়া রজনীকান্ত কহিল, "না, না, কোথাও যাব না। এই একবার বৈঠকখানায় যাচ্ছি।"

চারুবালা কহিল, "বৈঠকখানায় কি কাপড় পরে চাদর গায় দিয়ে যেতে হয় ?"

জেরায় পড়িয়া রজনীকান্ত কহিল, "আঃ কি বিপদ! এক-বার থিয়েটরে যাচ্চি তাও কি তোমায় বলে যেতে হবে ?"

রজনীকান্ত দুইটা মিথ্যা কথা কহিয়াছিল, চারুবালা তাহাকে তৃতীয় মিথ্যা কথা বলিবার অবকাশ দিল না। শয্যা হইতে নামিয়া আসিয়া স্বামীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু কহিল, "তুমি প্রায় রাত্রে উঠে কোথায় যাও আমি জানি। কার বাড়ী যাও তাও জানি।"

রজনীকান্ত অল্পক্ষণ বাক্‌শূন্য হইল। কিন্তু তাহার মনে ভয় অথবা লজ্জার অধিক স্থান ছিল না। অল্প চিন্তা করিয়া কহিল, "জান ত জিজ্ঞাসা কোরচ কেন ? তুমি শুতে যাও, আমিও যাই।"

"নিতান্তই যাবে ?"

"যাব না কেন ?"

"আমার কথায়। আমার একটা কথা রাখ্‌বে না ?"

"এখন নয়। আর এক দিন শুন্‌ব।"

"আমি এখানে একলা থাক্‌ব?"

"তা থাক্‌লেই বা! এখানে ত আর বাঘের ভয় নেই।"

তখনও চারুবালা উচ্ছ্বসিত উদ্বেলিত উত্তপ্ত অশ্রুধারা ঠেলিয়া রাখিল। কহিল, "আমার কথা যাক্‌। আমি না হয় একলা রইলাম। কিন্তু তুমি যে এমন কোরে উঠে যাও বাড়ীতে যদি আর কেউ টের পায়!"

"তুমি বলে দেবে, তাইতে টের পাবে?"

"আমি বলে দিলে ত কিছু অন্যায় হবে না।"

"তবে তাই ভাল, তুমি বলে দিও। এখন আমি চল্‌লাম।" রজনীকান্ত দ্বারের বাহিরে যাইতে উদ্যত হইল।

চারুবালা আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না। রুদ্ধ অশ্রু-প্রবাহ মুক্ত হইল, মুক্ত কণ্ঠ রুদ্ধ হইল। স্বামীর চরণে পতিত হইয়া, স্বামীর চরণ বাহুযুগলে ধারণ করিয়া রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, "আমি কাকে বল্‌ব? যা বল্‌বার তোমাকেই বলি। তোমার পায়ে ধর্‌চি, তুমি আমার এই কথাটি রাখ! আজ রাত্রে আর কোথাও যেও না।"

শান্ত চন্দ্ররশ্মি দেখিয়া যেমন কাহারও প্রচণ্ড রৌদ্রতাপ স্মরণ হয়, পদতললুণ্ঠিতা কাতরা ভার্য্যাকে দেখিয়া রজনীকান্তের সেই রূপ আতরকে স্মরণ হইল। চরণ মুক্ত করিয়া লইয়া কহিল, "আমি ত তোমায় বারণ কোর্‌চি নে, তুমি বলে দিও।

এখন আমি চল্লাম।” দ্বারের বাহিরে গিয়া দ্বার ভেজাইয়া দিয়া রজনীকান্ত চলিয়া গেল।

স্তব্ধ নিশীথে কত সহস্র দম্পতী একত্র শয়নে সুখস্বপ্ন দেখিতেছিল। কত নক্ষত্র ফুটিতেছিল, নৈশ সমীরণে কত সুখ-কাহিনী, কত প্রস্ফুটিত পুষ্প পরিমল প্রবাহিত হইতেছিল। সেই নিশীথ নক্ষত্রময় প্রহেলিকাময় সৌন্দর্য্য চারুবালা দেখিল না, সহস্র সুখের সে কিছুমাত্র অনুভব করিল না। দ্বারের নিকট ধরাতলে শয়ন করিয়া রহিল। এই মাত্র তাহার মনে হইতে-ছিল যেন তাহার স্বামী চলিয়া যাইতেছে, যাইতেছে, যাইতেছে, অবিশ্রান্ত চলিয়া যাইতেছে, পদশব্দ আর কেহ শুনিতে পাইতেছে না, শুধু সেই ধরাশায়িনী হতভাগিনী শুনিতে পাইতেছে। প্রতি পদক্ষেপ কোথায় পড়িতেছে? মাটীতে ত পড়িতেছে না। প্রতি পদশব্দ সেই ধরালুণ্ঠিত ভার্য্যার হৃদয়ে বাজিতেছে, প্রতি পদ-ক্ষেপে সে হৃদয় দলিত হইয়া যাইতেছে। স্বামী যেখানেই যাউক, যত দূরেই যাউক, প্রত্যেক পাদবিক্ষেপে স্ত্রীর হৃদয় তাহার পদতলে দলিত হইতেছে। যে চরণযুগল চারুবালা বাহুদ্বারা আলিঙ্গন করিয়াছিল সেই চরণতলে তাহার হৃদয় মর্দ্দিত হই-তেছে। নিষ্পিষ্ট হৃদয়ে চারুবালা সেই স্থানে পড়িয়া রহিল।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ।

পর দিবস এই কথা কর্ত্তার কাণে উঠিল। চারুবালা কাহাকেও কিছু বলে নাই। দীনবন্ধু কয়েক দিন হইতে একজন দরওয়ান নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহার প্রতি গোপনে আদেশ ছিল যে রজনীকান্তের প্রতি লক্ষ্য রাখে। রজনীকান্ত অজ্ঞাতে কি করে কোথায় যায় জানিয়া গোপনে কর্ত্তাকে সংবাদ দেয়। দরওয়ান প্রভাতে দীনবন্ধুকে জানাইল, "মহারাজ, ছোটা বাবু রাত্‌কো বাহার গেয়া।"

কর্ত্তা কহিলেন, "বটে? কাঁহা গেয়া?"

দরওয়ান মুখভঙ্গী করিয়া কহিল, "আরে বাবুজি, পুছিয়ে মত্, বড়া খারাপ জায়গা।"

বাবুজী আরও চাপিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, সকল কথা শুনিয়া অবশেষে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাড়ীতে কখন ফিরিয়া আসিল?"

দরওয়ান কহিল, "তিন চার বাজে—থোড়া রাত্ বাকি থা।"

দরওয়ান বিদায় হইল। দীনবন্ধু মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। যে আশঙ্কা মনে উদয় হইলে তিনি একেবারে অস্থির হইতেন সেই ভয় সম্পূর্ণ উপস্থিত হইল। ছেলে মূর্খ হইলে তেমন দোষের ছিল না, কিন্তু এমন করিয়া উচ্ছন্ন যাইলে তিনি লোকের

কাছে কেমন করিয়া মুখ দেখাইবেন? শাসনের ত কখন কোন রূপ অভাব হয় নাই যে রজনীকান্ত এমন করিয়া উচ্ছৃঙ্খল হইয়া নির্ল্লজ্জ হইয়া যাইবে! দীনবন্ধু নিজে কখন কোনরূপ অত্যাচার করেন নাই, তাঁহার চরিত্রে কখন কোন রূপ কলঙ্ক স্পর্শ করে নাই, শেষে কি না তাঁহারই বংশে এমন কুলাঙ্গার পুত্র জন্মিল! ভাবিতে ভাবিতে উত্তরোত্তর তাঁহার ক্রোধ বাড়িতে লাগিল। অবশেষে রজনীকান্তকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। রাত্রি জাগরণে রজনীকান্তের চক্ষু রক্তবর্ণ, পিতার সম্মুখে আসিয়া চক্ষু নত করিয়া দাঁড়াইল। দীনবন্ধু কহিলেন, "কাল রাত্রে কোথায় যাওয়া হয়েছিল?"

অত্যন্ত ভয়ে সঙ্কুচিত হইয়া রজনীকান্ত কহিল, "কোথাও ত যাই নাই।"

দীনবন্ধু অত্যন্ত রাগিয়া উঠিয়া কহিলেন, "পাজি, বদমায়েস, আবার মিথ্যা কথা! তুমি কি মনে কর আমি কিছু জানি না!"

রজনীকান্ত চুপ করিয়া রহিল। দীনবন্ধু যাহা মুখে আসিল তাহাই বলিয়া গালি দিলেন। শেষে কহিলেন, "বাড়ী থেকে দূর হয়ে যা! আবার যদি কখন বাড়ীতে ঢুকিস্ ত দরওয়ানকে দিয়া গলা ধাক্কা দিয়া বাহির করিয়া দিব।"

তখন রজনীকান্ত সহসা ভয় ভুলিয়া গিয়া ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে কহিল, "কোন্ বেটা দরওয়ান আমার গায় হাত দেয়

একবার দেখি! এখনও কি আমায় ভয় দেখাইবেন মনে করিয়াছেন? বাড়ী হইতে আমি এখনি যাইতেছি।”

দীনবন্ধু স্তম্ভিত হইলেন। যে পুত্র ভয়ে জড় সড় হইয়া তাঁহার সম্মুখে একটা কথা কহিতে সাহস করিত না তাহার ক্রুদ্ধ মূর্ত্তি দেখিয়া তিনি বাক্‌শূন্য হইলেন। রজনীকান্ত বাহির হইয়া গেল।

চাদর ও জুতা লইবার জন্য রজনীকান্ত ভিতরে গেল। ভিতরে গৃহে ধরাসনে চারুবালা বসিয়াছিল। তাহাকে দেখিয়া রজনীকান্তের ক্রোধ দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিল। কহিল, “বাবাকে বলে দেওয়া হয়েছে! মনে করেছ তা হলে আমি ভয়ে অস্থির হব।”

অনিদ্রায়, রোদনে চারুবালার মুখ ম্লান, চক্ষু ফুলিয়াছে। কাতরস্বরে কহিল, “আমি কাউকে বল্‌ব কেন? আমি ঘরের বাইরে একবারও যাই নি।”

রজনীকান্ত কহিল, “তুমি কেন যাবে? আমি বাড়ী থেকে একেবারে বেরিয়ে যাচ্চি, তা হলে তুমি সুখে থেকো।”

কথাটা চারুবালা বুঝিতে পারিল না। রজনীকান্ত আর কিছু না বলিয়া চলিয়া গেল।

যখন প্রকাশ হইল যে কর্ত্তা রজনীকান্তকে গৃহবহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছেন, তখন বাড়ীতে অত্যন্ত কোলাহল উপস্থিত হইল। গৃহিণী রোদন করিতে করিতে কর্ত্তাকে গিয়া কহিলেন, “করেছ কি?”

দীনবন্ধু কহিলেন, "ভালই কোরেছি। এমন ছেলেকে বাড়ীতে স্থান দেব? এমন ছেলে থাকার চেয়ে না থাকা ভাল।"

গৃহিণী কহিলেন, "ঘরে একটা বউ আছে তা কি তোমার মনে নেই? ছেলে কি এখনও ছেলেমানুষ আছে যে ধমক দিলে গালাগালি দিলেই শুধ্‌রে যাবে? ছেলে যদি একেবারে মন্দ হয়ে যায়, রাস্তায় রাস্তায় বেড়ায় ত বদ্‌নাম হবে কার? তাকে কোন রকম কোরে বুঝিয়ে সুঝিয়ে সাবধান কোরে রেখে যাতে আস্তে আস্তে শুধ্‌রে ওঠে সে চেষ্টা কোর্‌তে হয়, না রাগের মাথায় তাকে বাড়ী থেকে বার্‌ কোরে দিয়ে তুমি নিশ্চিন্ত হলে।"

দীনবন্ধু কহিলেন, "আমি তার মুখ দর্শন কোর্‌তে চাইনে, তোমাদেরও কোন কথা শুন্‌তে চাইনে। যা কোরেছি বেশ কোরেছি।"

গৃহিণী আর কোন কথা না বলিয়া আপনার ঘরে গিয়া কাঁদিতে বসিলেন।

দীনবন্ধু ত একেবারে নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না! কত দুর্ভাবনা তাঁহার মনে উদিত হইতে লাগিল। ভাবনা প্রধানতঃ নিজের জন্য, রজনীকান্তের জন্য নহে। তাঁহার পুত্র দুশ্চরিত্র হইয়া গিয়াছে লোকে শুনিলে কি বলিবে! এ কথা রাষ্ট্র হইলে তাঁহার কতখানি মাথা হেঁট হইবে! পূর্ব্বে পুত্রের মনে ভয় হইত যে পথে পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে কি হইবে! এখন

পিতার মনে ভয় হইতে লাগিল যে যদি পথে কোথাও পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ হয়! চারিদিকে তাঁহারই ত অপযশ রটিবে! পুত্র হওয়া কি পাপ! তিনি কখনও শাসনের ত্রুটি করেন নাই, কখন কোন সন্তানকে আদর দেন নাই তবে এমন বিগড়াইয়া গেল কেন? হঠাৎ গোবিন্দচন্দ্রের একটা কথা স্মরণ হইল। তিনি বলিয়াছিলেন যে একবার শাসনের ভয় ভাঙ্গিয়া গেলে আর কিছু-তেই শাসন করা যায় না। পুত্রের শিক্ষায় নিরবচ্ছিন্ন শাসনের দোষ এই। দীনবন্ধু নিজে ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিতে-ছিলেন না, গোবিন্দচন্দ্রের সহিত একবার পরামর্শ করিবার সঙ্কল্প করিলেন।

বৈকালে গোবিন্দচন্দ্রের গৃহে গমন করিলেন। গোবিন্দচন্দ্র একাকী, বন্ধুগণ তখনও আসিয়া উপস্থিত হন নাই। দীনবন্ধুকে চিন্তিত ও বিষণ্ণ দেখিয়া গোবিন্দচন্দ্র কিছু উদ্বেগের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে? সব ভাল ত!"

দীনবন্ধু কহিলেন "কিছুই ভাল নয়! লোকের কাছে মুখ দেখান ভার হয়েচে। ছেলেটা অধঃপাতে গিয়েছে।"

"কে? রজনী? কেন? ব্যাপারখানা কি শুনি!"

দীনবন্ধু কথাটা খুলিয়া বলিলেন। অবশেষে কহিলেন, "হতভাগার বিবাহ দিয়াছি, বধূ ঘরে রহিয়াছে। এমন বুদ্ধি যে তাহার কেন হইল কিছুই বুঝিতে পারি না।"

গোবিন্দচন্দ্র কহিলেন, "বুঝিতেই যদি পারা যাইবে তাহা

হইলে আর ভাবনা কি? যে অধঃপাতে যায়, কেন যায় কিছুই বলা যায় না। এই জন্যই তোমায় বলিয়াছিলাম যে ক্রমাগত শাসনে কোন ফল হয় না। এখন কি করিবে?"

"সেই কথাই তোমায় জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি।"

"ছেলে যখন ছোট থাকে ইচ্ছামত মারিয়া ধমক দিয়া আমরা শাসন করি। কিন্তু ভয়েই কি ছেলে চিরকাল বশীভূত হয়? মারিবার ধমক দিবার যে একদিন ক্ষমতা থাকিবে না, শাসনে ছেলে ভয় পাইবে না এ কথাটা আমরা স্মরণ করি না।"

"তাহা ত বুঝিতে পারিতেছি। এখন কি করিব?"

"গৃহবহিষ্কৃত করিয়া দিয়াও ভাল কাজ কর নাই। এখন তাহার ভয়ও নাই, লজ্জাও নাই। এদিকে তাহার মাতার মনকষ্ট, স্ত্রীর মনকষ্ট। এ বয়সে একবার এমন হইলে যে একেবারে অধঃপাতে গেল এমন বিবেচনা করিবারও কারণ নাই। শোধরাইলে শোধ্‌রাইতেও পারে, এমন অনেক শোধ্‌রাইয়া থাকে।"

"তাহাকে কি আবার ডাকাইয়া পাঠাব? তাহা হইলে ত আরও বাড়াবাড়ি করিবে।"

"তুমি ডাকাইয়া পাঠিও না। স্ত্রীলোকেরা যাহা ইচ্ছা হয় করুক, তুমি তাহাতে কোন বাধা দিও না। কিন্তু ফিরিয়া আসিলে একবার বুঝাইয়া, ভাল কথা বলিয়া, দেখিও। মন্দ কথায় ত কোন ফল হইল না।"

দীনবন্ধু উঠিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। গোবিন্দচন্দ্র

কহিলেন, "দেখ, লোকে কেন অধঃপাতে যায় একবার ভাবিয়া দেখিয়াছ ? প্রথমে বয়সে ত কথাই নাই, কিন্তু বয়সেরও কোন সীমা নাই। অধঃপাতে যাওয়া এত সহজ যে কেহ যে রক্ষা পায় এই আশ্চর্য্য। কথাটা তোমায় স্পষ্ট করিয়া বলি। তুমি আমার সহিত পরামর্শ করিতে আসিয়াছ ইহাতে আমি লজ্জিত হইয়াছি। আমি স্বয়ং অধঃপাতে যাইতেছি, আর কাহাকেও কি পরামর্শ দিব ?"

দীনবন্ধু কহিলেন, "ওটা তোমার বাড়ান কথা। তুমি এখন যাহা কর তাহাই শোভা পায়। আর তুমি ত ঢলাঢলি কিছু কর না।"

গোবিন্দচন্দ্র কহিলেন, "আমার মুখের উপর আর কি বলিবে ?"

গৃহে ফিরিয়া আসিয়া দীনবন্ধু গৃহিণীকে কহিলেন, "ছোঁড়াকে ডাকাইয়া তোমরা যদি বুঝাইতে পার ত বোঝাও। তাহাকে দেখিলে আমি রাগ সামলাইতে পারিব না।"

বিংশ পরিচ্ছেদ।

পিসিমা যদি কোন দিন মালা জপিতে ভুলেন ত শ্যামার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে ভুলেন না। শ্যামা হঠাৎ পাশের বাড়ীতে যাওয়া আসা বন্ধ করিল। প্রথম দুই এক দিন পিসিমা কিছু বলিলেন না। তাহার পর শুনিলেন মুক্তর ভাই গ্রামে ফিরিয়া গিয়াছে। তখন পিসিমা আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। শ্যামাকে নির্জ্জনে পাইয়া কহিলেন, "হ্যাঁ লা শ্যামা, এখন যে বড় আর ও বাড়ী যাস্ নে?"

পিসিমা কথাটা খুব চিবাইয়া বলিলেন। শ্যামা যেন কিছু জানে না, নিতান্ত ভাল মানুষটীর মত কহিল, "কোন্ বাড়ী? কথাটা পষ্ট কোরে তোমার যেন বল্‌তে নেই।"

পিসিমা নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া, অল্প নাকী স্বরে, মস্তক ও হস্ত ঈষৎ দোলাইয়া কহিলেন, "নেকি আর কি! রোজ রোজ কার্ বাড়ী যাওয়া আসা করিস্ কিছু কি জানিস্ নে?"

"তা কার বাড়ী বল্‌তে নেই? কেন, মুক্তর নাম কি তুমি জান না? তা যাই না যাই তোমার সে ভাবনা কেন? আমার জন্য তোমার কেন ঘুম হয় না বল দেখি!"

পিসিমা কহিলেন, "তুই ত তাই চাস্। সকলে যদি নিশ্চিন্ত

কচ্ছিমায় তা হলে তোর আর ভাবনা কি! কিন্তু মাথার 'পর ভগবান ত আছেন।”

শ্যামা একটু কোন্দলের ভাবে কহিল, “আমার ভগবান আছেন আর তোমার কি ভগবান নেই? তোমার মন বুঝি ভগবান জানেন না?”

পিসিমা তখন রাগিলেন না। কহিলেন, “আমি যদি পাপ কোরে থাকি ত সে কি আর ছাপা থাক্‌বে? তোকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। মুক্তর ভাইকে কেন বিদায় কোরে দিয়েচে তাও কি তুই জানিস্ নে?”

শ্যামা কহিল, “কেন বিদায় কোরে দিয়েচে তুমিই জান। দেশে গেলেই বুঝি বিদায় কোরে দেওয়া হয়?”

পিসিমা কহিলেন, “আমি ত আর নিত্য তাদের বাড়ী যাইনে যে জান্‌ব? কি হয়েচে ভগবান জানেন, কিন্তু লোকের ত আর মুখ চাপা দেওয়া যায় না।”

শ্যামা কহিল, “লোকের যা ইচ্ছে হয় বলুক, তোমার যা মনে হয় বল। তা আমায় আবার বল্‌তে এসেছ কেন?” সহসা শ্যামার চক্ষু বাষ্পপূর্ণ হইল, সে উঠিয়া গেল।

পূর্ব্বে কখন শ্যামার এরূপ হইত না। তাহার হৃদয় এমন শুষ্ক কঠিন হইয়া গিয়াছিল যে তাহার চক্ষে কখন জল আসিত না। পাষাণে আঘাত লাগিলে যেমন ব্যর্থ হয় তাহার হৃদয় হইতে দুর্ব্বাক্য সেই রূপ প্রতিহত হইত। এখন তাহার প্রকৃতি কোমল,

আর্দ্র হইয়াছিল, সহজেই তাহার হৃদয়ে আঘাত লাগিত, চক্ষে জল আসিত। শ্যামা উঠিয়া গিয়া ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া অনেক রোদন করিল। কেন কাঁদিল নিজেই কিছু বুঝিতে পারিল না। কেহ তাহাকে ত এমন বিশেষ মন্দ কথা কিছু বলে নাই! পিসিমা কখন কি না বলেন যে তাঁহার কথায় শ্যামার দুঃখ হইবে? তাঁহার কথায় বাস্তবিক শ্যামার কষ্ট হয় নাই। আপনা আপনি কেমন যেন তাহার হৃদয়ের উৎস মুক্ত হইয়া চক্ষু হইতে অজস্র অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। শ্যামার মনে স্পষ্ট কোন কথা উঠিল না। সমস্ত যেন বাষ্পময়, অশ্রুময়, যন্ত্রণাময় বোধ হইতে লাগিল। শ্যামার চক্ষে যে সংসার সুন্দর দেখাইতেছিল এমত নহে, কিন্তু পূর্ব্বে যেমন সমস্ত অসুন্দর দেখিত, যাহা শুনিত তাহাই শ্রুতিপরুষ বোধ হইত, সেই ভাবের কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। দূর স্বপ্ন সম্ভাবনার ন্যায় যেন সুখের আশা তাহার অন্তরে উদিত হইয়াছিল। তাহাতেও আঘাত লাগিয়াছিল। জলচর জীবিত শঙ্খ যেমন অত্যন্ত সাবধানে অস্থিকোষের বাহিরে গমন করে, কিন্তু শঙ্কিত হইলে অথবা আঘাত প্রাপ্ত হইলে তৎক্ষণাৎ দুর্ভেদ্য দেহাবরণের মধ্যে লুক্কায়িত হয়, শ্যামারও কতক সেইরূপ হইল। কিন্তু যেখানে আঘাত লাগিয়াছিল ক্ষতস্থান শীঘ্র আরোগ্য হইল না। অল্প আঘাত লাগিলেই অত্যন্ত যন্ত্রণা বোধ হইত।

দুই এক দিনের মধ্যে চারুবালার শ্বশুর বাড়ী হইতে অত্যন্ত অপ্রিয় সংবাদ আসিল। শ্যামার মন একেবারে কেমন অস্থির

হইয়া উঠিল। চারুবালার দুঃখে সে বড়ই দুঃখী হইল। কতক কৌতূহল, কতক যথার্থ দুঃখ। চারুবালা কত দুঃখেই না জানি আছে! জামাই দেখিতে এমন ভালমানুষটীর মত ছিল, হঠাৎ কেমন করিয়া এমন হইয়া গেল! সে ছুঁড়িটা কেমন? তাহার কি গুণ আছে যে তাহাকে দেখিয়া রজনীকান্ত ভুলিল! সর্ব্বনাশী মাগী! আহা! চারুবালাকে দেখিতে পাইলে শ্যামা তাহাকে কত সান্ত্বনাই করিত, তাহার সঙ্গে কত কাঁদিত, রজনীকান্তকে সুবুদ্ধি দিবার কতই পরামর্শ দিত!

চারুবালার মা নিজেই তাহাকে আনিবার কথা পাড়িলেন, কিন্তু শ্যামা সব চেয়ে জিদ্ করিতে লাগিল। চারুবালার মা কন্যাকে শ্বশুরালয় হইতে আনাইতে লোক পাঠাইলেন কিন্তু চারুবালা কিছুতেই আসিতে স্বীকৃতা হইল না। সে অভিমান, আদর, সে পিত্রালয়ের উপর অনুরাগ কোথায় ভাসিয়া গিয়াছিল! প্রথম যৌবনের আনন্দ উচ্ছ্বাস, নিশ্চিন্ততা, চঞ্চলতা একেবারে নিঃশেষ হইয়াছিল। তাহার হৃদয় চূর্ণ হইয়া গিয়াছিল—বেদনা আছে কি না ভাল অনুভব করিতে পারিত না—লজ্জা, অপমান, নিরতিশয় যন্ত্রণা সকল একত্রে—সে কেমন করিয়া বুঝিবে কোন্ যন্ত্রণা তাহার অধিক হইতেছে? তাহার তৃষিত মুখে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ পতিত হইয়াছিল—অন্তরাত্মা যেন দগ্ধ ভস্ম হইয়া গিয়াছিল। কাহাকে মুখ দেখাইবে, কোন্ সুখে মুখ দেখাইবে? বাপ মা কি তাহার এই লজ্জা, এই যন্ত্রণা দূর

করিতে পারিবেন? পিত্রালয়ের লোক অনেক সাধাসাধি করিল, শ্বাশুড়ী পর্য্যন্ত যাইতে বলিলেন কিন্তু চারুবালা কোন মতে যাইতে চাহিল না। তাহার মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে কেহই বুঝিতে পারিল না। এমন স্থলে বালিকা নাই, যুবতী নাই, প্রৌঢ়া নাই, যে বুঝিতে পারে সেই বুঝে যে এমন দুঃখের নিবৃত্তি নাই, কোন উপায়ে সে দুঃখের অবসান নাই। যে দুঃখ হইতে দূরে যাইতে পারিলে দুঃখের উপশম হয় ইহা সে জাতীয় দুঃখ নহে, যতই দূরে যাইবে ততই যন্ত্রণা বাড়িবে। বরং যে কারণে দুঃখ, যাহার জন্য দুঃখ তাহার নিকট থাঁকিলে যন্ত্রণা কতক পরিমাণে সহ্য হয়। নিকটে থাকিলে এক যন্ত্রণা, দূরে থাকিলে সহস্র যন্ত্রণা। দেখিতেছি যাহার মুখ চাহিয়া জীবন ধারণ করিয়া আছি সে নিত্য নিষ্ঠুরের ন্যায় আমার হৃদয় চরণদলিত করিতেছে। সেই যন্ত্রণা দিবারাত্র ভোগ করিতেছি। কিন্তু যন্ত্রণার পরিমাণের ইয়ত্তা থাকে। যদি দূরে যাই তাহা হইলে সেই যন্ত্রণা শতগুণ বর্দ্ধিত হয়। প্রথমতঃ দুঃখের পূর্ণ মাত্রা জানিনা বলিয়া বিষম যন্ত্রণা, তাহার পর চারিদিকে লোকের কৌতূহল, শেল সম লোকের সান্ত্বনা বাক্য। চারুবালার যাহা কর্ত্তব্য সে তাহাই করিল। পিত্রালয়ে গেল না।
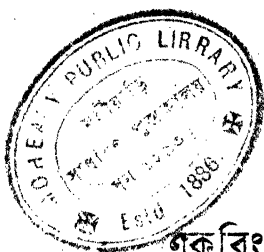
একবিংশ পরিচ্ছেদ।

এই সময় স্বর্ণময়ী দিন কয়েকের জন্য মাতুলালয়ে গিয়াছিল। সেখানে চারুবালা নাই। চারুবালাকে আনিতে গেলে সে নিজে লোক ফিরাইয়া দেয়। চারুবালার দুঃখের কথা স্বর্ণ কত রকম শুনিল। কেহ দশটা কথা বেশী করিয়া বলিল, কেহ এক রকম বলিল, আর একজন আর এক রকম বলিল। শুনিয়া স্বর্ণময়ী কত কি ভাবিতে লাগিল। চারুবালার যে বড় যাতনা হইয়াছে বুঝিতে পারিল। তাহার পর নিজের কথা ভাবিয়া দেখিল। চারুবালার যে অবস্থা হইয়াছে তাহারও যদি সেই দশা হইত! তাহাকে ত্যাগ করিয়া তাহার স্বামী যদি বেশ্যাতে অনুরক্ত হইত! সে কল্পনায় তেমন দুঃখ অনুভব করিল না। তাহার কপালে অন্য রকম দুঃখ ছিল, সেই দুঃখকে সে সুখের মত করিয়া বুকে আঁকড়িয়া ধরিত। অল্পবুদ্ধি, ঈর্ষাপূর্ণ স্বামীর হাতে পড়িয়া তাহার হৃদয় আরও সঙ্কুচিত হইয়াছিল, এবং সেই জন্য পূর্ব্বানুরাগ আরও বলবৎ হইয়া উঠিতেছিল। হিসাবে তাহার বয়স এখনও কাঁচা, কিন্তু স্বভাব আর তেমন ছিল না। এখন অনেক কথা নিজের মনে রাখে, কাহাকেও বলে না। হয়ত সে সব কথা কাহাকেও বলিবার নয়। যে সকল কথা একেবারে মনে

স্থান দেওয়া উচিত নয় সেই সকল কথাই মনের ভিতর যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখিত।

মাতুলালয়ে হেমন্তকুমারের সহিত স্বর্ণের আবার দেখা হইল। এখন স্বর্ণের মনে আরও অধিক সঙ্কোচ, কাহারও সাক্ষাতে হেমন্তকুমারের সহিত কথা কহিতে চায় না। যদি আর কেহ দেখিতে পায়, দেখিয়া কান্তিচন্দ্রকে বলিয়া দেয়! কিন্তু হেমন্তকুমারের সহিত কথা কহাটাই যে দোষ এটা তাহার মনে হইত না। মনে হইলে হৃদয়ের বেগে সে কথা স্থান পাইত না।

এইরূপ অপরের অসাক্ষাতে তাহাদের একবার দেখা হইল। অধিক কথা কহিবার অবকাশ ছিল না, যদি কেহ আসিয়া পড়ে। স্বর্ণর হাতে একখানা কেতাব ও একটা পেন্সিল ছিল। সে গুলা হেমন্তকুমারের হাতে দিয়া বলিল, "তোমার ঠিকানা লিখে দাও। যদি কখন আবশ্যক হয় ত তোমায় লিখ্‌ব।"

হর্ষোৎফুল্ল মুখে, আগ্রহ সহকারে হেমন্তকুমার জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি আমায় চিঠি লিখ্‌বে?"

স্বর্ণ তৃষিত নয়নে হেমন্তকুমারের মুখের দিকে চাহিয়া, অতি ধীর স্বরে কহিল, "দরকার হলে লিখ্‌ব। তোমায় যদি কিছু বল্‌বার হয় লিখ্‌ব।"

হেমন্তকুমার ঠিকানা লিখিয়া দিল।

দূর হইতে ভবিতব্যতা তাহাদিগকে সঙ্কেত করিয়া ডাকিতে-

ছিল। তাহারা কিছুই দেখিতে পাইতেছিল না, অজ্ঞাতে সেই সঙ্কেতানুসরণ করিতেছিল।

স্বর্ণ মাতুলালয়ে গমন করিলেই কান্তিচন্দ্রের মনে মনে সন্দেহ হয়। এই জন্য স্বর্ণ শ্বশুরবাড়ী ফিরিয়া গেলেও কান্তিচন্দ্র প্যারীমাধবের গৃহে গিয়া বালকদিগকে লইয়া নানা প্রকারে জেরা করিতে আরম্ভ করিল। স্পষ্ট কোন কথা প্রকাশ হইল না কিন্তু কান্তিচন্দ্র শুনিল হেমন্তকুমার পূর্ব্বে যেমন বাড়ীর ভিতর যাইত সেই রকম গিয়া থাকে। স্বর্ণ কি তাহার সম্মুখে বাহির হয়? কেন হইবে না? বারণ আছে না কি? বারণ যে কে করিয়াছিল ছেলেরা তাহা জানিত না। তাহারা ভাবিত পূর্ব্বে সব যেমন ছিল এখনও বুঝি সেই রকম আছে। স্বর্ণ বরাবর হেমন্তকুমারের সহিত কথা কহিত এখন কেন কহিবে না? কহিত কি'না তাহারা কেহ লক্ষ্য করিয়া দেখে নাই, স্পষ্ট হাঁও বলিতে পারিল না, নাও বলিতে পারিল না। এ সকল কথা তাহারা বড় কাণে আনে না, অন্য কথা পাড়ে। সকল কথা শুনিয়া নিজের মন হইতে কান্তিচন্দ্র একটা কিছু খাড়া করিল। মনে মনে একটা কিছু সিদ্ধান্ত করিয়া গেল।

স্বর্ণময়ী সবে মাতুলালয় হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে। রাত্রে কান্তিচন্দ্র ঘরে প্রবেশ করিয়াই একেবারে অগ্নিমূর্ত্তি!

"তুমি সেই বদমায়েশটার সঙ্গে ফের কথা কয়েচ?"

হেমন্তকুমারকে বদমায়েশ বলিবার কোন প্রকাশ্য কারণ

ছিল না। সকলে তাহাকে খুব ভাল ছেলে বলিয়াই জানিত, বিশেষ মূর্খ কান্তিচন্দ্রের সহিত তাহার তুলনাই হয় না। কিন্তু রাগের মুখে ও হেমন্তকুমারের অসদভিপ্রায় সন্দেহ করিয়া কান্তিচন্দ্রের মুখে গালি আসিল।

কথাটা যদি কান্তিচন্দ্র অন্য রকম করিয়া পাড়িত ত বোধ হয় ভাল হইত। যদি গোড়ায় স্বর্ণকে দুটা মন্দ কথা বলিত ত কোন ক্ষতি হইত না। কিন্তু প্রথমেই হেমন্তকুমারকে গালি দিয়া অন্যায় করিল। স্বর্ণ একেবারে কঠিন হইয়া গেল। আর কোন কথা তাহার নিকট পাওয়া অসম্ভব।

স্বর্ণ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কহিল, "কার্ কথা বল্‌চ?"

"নেকি আর কি! যেন কিছু জানেন না! কে আবার! সেই বসন্তকুমার না শরৎকুমার, যাকে দেখ্‌বার জন্য কেবল মামার বাড়ী যাওয়া হয়।"

"মামার বাড়ী যাওয়া বারণ কোরে দিলেই আর যাব না।"

কান্তিচন্দ্র আরও রাগিয়া উঠিল, বলিল, "আমার কথার এখন জবাব দাও। তার সঙ্গে আবার কথা কয়েচ কি না?"

"তুমি ত তার সঙ্গে কথা কইতে বারণ কোরেচ।"

"আমার সব বারণ শোনা হয় কি না! আবার কেন তার সঙ্গে কথা কইলে?"

স্বর্ণময়ী অম্লান মুখে, স্থির স্বরে বলিল, "কে বল্‌লে তার সঙ্গে আমি কথা কয়েচি? কেউ কি আমায় কথা কইতে দেখেচে?"

কান্তিচন্দ্র কিছু প্যাঁচে পড়িল। কথা কহিতে কেহই দেখে নাই। কিন্তু তাহা বলিলে কান্তিচন্দ্রের একেবার হার হয়। সুতরাং সে আরও রাগিয়া বলিল, "যখন কেউ দেখ্‌তে না পায়, সেই সময় বুঝি কথা কওয়া হয়? এখন নিজের মুখেই স্বীকার করা হচ্চে।"

স্বর্ণময়ী বলিল, "আমি স্বীকার করি আর না করি তুমি ত বল্‌চ। তা ঝগড়া কর্‌বার আবশ্যক কি, তোমার যা ইচ্ছা হয় কর আমি আর কিছু বল্‌ব না।"

থপ্‌ করিয়া কান্তিচন্দ্র একটা দুর্ব্বাক্য বলিয়া ফেলিল, যে কথায় স্ত্রীলোকের চরিত্রের প্রতি কলঙ্ক আরোপিত হয়, যে কথা তাহাদের মর্ম্মে বিদ্ধ হয়, সেই কথা বলিল। মূর্খ, অবুঝ, অসংযত-স্বভাব যুবক কথাটা বুঝিয়া দেখিল না।

সেই কথা শুনিয়া স্বর্ণময়ী শয্যা ত্যাগ করিয়া বেগে উঠিয়া দাঁড়াইল। বক্ষস্থল চিরিয়া তপ্ত লৌহের চিহ্ন দিলে যেরূপ জ্বলিয়া উঠে, তাহার প্রাণের ভিতর সেইরূপ জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু মুখে যন্ত্রণার কোন চিহ্ন নাই। যেখানে ভালবাসা সেইখানে অভিমান। ভালবাসাই যেখানে নাই-সেখানে আবার অভিমান কি! স্বর্ণময়ীর দেহ স্থির। মুখ স্থির। অত্যন্ত স্থির কিন্তু কিছু বিকৃতস্বরে কহিল, "তুমি যদি আমায় তাই মনে কর ত আমার কাছে তোমার থাকা উচিত নয়। আমি না হয় বাইরে যাচ্চি।"

যদি স্বর্ণময়ী কাঁদিয়া ফেলিত, যদি তাহার স্বামীকে কাতরস্বরে অনুনয় করিত তাহা হইলে হয়ত কান্তিচন্দ্র নরম হইয়া যাইত। কিন্তু এই ভীতিশূন্য কিশোরীকে দেখিয়া সে ক্রোধে অন্ধ হইয়া উঠিল। ক্রোধে ফুলিয়া, দন্ত নিষ্পেষিত করিয়া কহিল, "অমনি যাবে? আমি তোমাকে দূর কোরে দিচ্চি!"

কান্তিচন্দ্র রাগিয়া উঠিয়া স্বর্ণময়ীকে একটা ঠেলা দিল। বোধ হয় লাথি মারিল। তথাপি স্বর্ণ কাঁদিল না। কোন শব্দ করিল না। দরজা খুলিয়া ঘরের বাহির হইয়া গেল।

আজ পর্য্যন্ত এ রকম কখন হয় নাই। স্বর্ণময়ী ঘরের বাহিরে যাইতেই কান্তিচন্দ্রের রাগ পড়িয়া গেল। রাগের বিশেষ কারণও ছিল না। যদি স্বর্ণ বাহিরে গিয়া আর কাহাকেও বলিয়া দেয় তাহা হইলে কি হইবে? তাহার কি অপরাধ? না হয় মামার বাড়ী কাহারও সহিত কথা কহিয়াছিল। সে জন্য এত রাগারাগি কেন? কান্তিচন্দ্র ভাবিতে লাগিল, এতটা রাগ করা কাজটা ভাল হয় নাই। খানিকক্ষণ ভাবিয়া চিন্তিয়া দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিল। এদিক ওদিক চাহিয়া কোথাও স্বর্ণকে দেখিতে পাইল না। সে কোথায় গেল? কাল প্রাতে নিশ্চয় একটা কাণ্ড বাধিবে। হয়ত আজই রাত্রে স্বর্ণের মুখে শুনিয়া বাড়ীর কেহ তাহাকে ভর্ৎসনা করিতে আসিবে। কান্তিচন্দ্র বড় গোলে পড়িল। একবার বাহিরের দরজা পর্য্যন্ত গেল, দরজা বন্ধ। অন্ধকারে যে অধিক দূর যাইবে পুরুষসিংহের

এতখানি ভরসা ছিল না। আর একবার চারিদিকে চাহিয়া আস্তে আস্তে ঘরে ফিরিয়া আসিয়া দরজা ভেজাইয়া শয্যায় উপবেশন করিল। কোথাও কোন সাড়া শব্দ নাই। স্বর্ণ কোথায় গেল? রাত্রি বাড়িতে লাগিল, কান্তিচন্দ্রের বড় ঘুম পাইতে লাগিল। স্বর্ণ কি দাসীদিগের ঘরে গিয়া শয়ন করিয়া রহিল, না ঠান্‌দিদির ঘরে গেল? কান্তিচন্দ্র আর বসিতে না পারিয়া শুইয়া পড়িল। প্রভাতে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। স্বর্ণ তখনও ঘরে ফিরিয়া আসে নাই। কান্তিচন্দ্র তাড়াতাড়ি বহির্ব্বাটীতে চলিয়া গেল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

স্বর্ণময়ী শয়নগৃহ হইতে বাহির হইয়া একেবারে ছাদে উঠিয়াছিল। ছাদে যাইতে কান্তিচন্দ্রের সাহস হয় নাই। কিন্তু সে সময় স্বর্ণের মনে ভয়ের লেশমাত্র ছিল না। ছাদের সিঁড়িতে যদি একটা ব্যাঘ্র বসিয়া থাকিত তাহা হইলে স্বর্ণ স্বচ্ছন্দে তাহার মুখে যাইত।

অপমান, দুঃখ, অভিমান কতক তাহার হইয়াছিল বটে, কিন্তু সেটা কেবল বয়সের গুণ। নবীন বয়সে সব সরস থাকে, হৃদয়ের একটা উৎস মুক্ত হইলে শত শত উৎস মুক্ত হইয়া যায়। মুখে যত হাসি চক্ষে তত জল। জীবন তরুর মূল শুষ্ক হইতে আরম্ভ হইলে, মনের, হৃদয়ের বেগ ও উচ্ছ্বাস আপনা আপনি হ্রাস হইয়া আসে। স্বর্ণময়ী খানিক কাঁদিল, খানিক অভিমান করিল, কিন্তু এরূপ মনের ভাব অধিকক্ষণ রহিল না। ভাবিল, কেন এমন অপমান সহিব, কাহার জন্য সহিব? এ যন্ত্রণা কি এড়ান যায় না? এখানে থাকিয়া কেন মিছামিছি গালি খাইব? মারই বা খাইব কেন? ক্রমাগত তাহার রাগই বাড়িতে লাগিল।

রাগও অধিকক্ষণ রহিল না। রাত্রি অন্ধকার, অন্ধকার আকাশে চারিদিকে নক্ষত্র ফুটিয়াছিল। মৃদুমন্দ, শীতল নৈশ

পবন বহিতেছিল। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের মন চিরকাল, সকল স্থানে বাঁধা। চারিদিক হইতে লক্ষ লক্ষ, অদৃশ্য বাহু আমাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে। যেখানে প্রকৃতি হাস্য-কোলাহলময়, মানুষেরও মন সেখানে প্রসন্ন হয়। প্রকৃতি যেখানে উদাস, সেখানে মানুষ বিষণ্ণ; যে স্থানে প্রকৃতির মূর্ত্তি গম্ভীর, মানুষ সে স্থানে চিন্তাযুক্ত হয়। মানুষের মন বাহ্য প্রকৃতির মুকুর মাত্র। সেই অন্ধকার রাত্রির দিকে চাহিয়া একবার স্বর্ণময়ী ভাবিল, এখন মরি না কেন, এখন মরিলে কেহ দেখিতে পাইবে না। বাঙ্গালীর মেয়ে, একবার মনে আঘাত লাগিলে মরিবার কথাটাই আগে মনে করে। মরিবার অপেক্ষা সহজ আর কোন উপায় খুঁজিয়া পায় না। কিন্তু সে কথাও স্বর্ণময়ীর মনে বসিল না। এই মাত্র জীবনের দ্বারে বসিয়া—ভিতরে কি আছে দেখিতে ইচ্ছা হয় না? এখন অন্ধকার বটে, হৃদয়ের ভিতরে, বাহিরে আকাশে, পৃথিবীতে অন্ধকার, কিন্তু চিরকাল কি এইরূপ অন্ধকার থাকিবে? রাত্রি ত ফুরায়, অন্ধকারের পর ত আলোক আসে, মানুষের কি দুঃখ ফুরায় না? ক্রমে ক্রমে নিশীথের গম্ভীর রহস্য তাহাকে স্পর্শ করিল। কেন মানুষের এমন সুখ দুঃখ, প্রকৃতির শান্তিময়ী মূর্ত্তি দেখিয়া সকলে শান্তির অন্বেষণ করে না কেন? এরূপ মনোভাব অধিকক্ষণ রহিল না। আবার হৃদয়ে বিদ্রোহের, বিরোধের ভাব উপস্থিত হইল। কেন তাহার এমন বিবাহ হইল? সে বিবাহে অসম্মতি

প্রকাশ করিয়াছিল, তাহার কথা কেহ কাণে তুলিল না কেন? এতদিন ত শাসনে গেল, তাহার পর এই দুর্গতি! সে যে এতকাল কোন কথা কঁহে নাই, নীরবে সকল সহ্য করিয়া আসিতেছিল এই ত তাহার ফল হইল! এখন এই বন্ধন শাসন ছিন্ন করিয়া একবার নিজের ইচ্ছামত কর্ম্ম করিয়া দেখুক না কেন? অন্ধকারে কে যেন তাহাকে স্পষ্টাক্ষরে বলিতে লাগিল, এখানে আর কত দিন এ যন্ত্রণা ভোগ করিবি? বাহির হইয়া আয়, দেখ্, বাহিরে সুখ আছে, স্বাধীনতা আছে, যাহার জন্য তোর প্রাণ কাঁদে, সে বাহিরে আছে। সে কথা যেন অপ্রতিহত হইয়া স্বর্ণময়ীর হৃদয়ে প্রবেশ করিল।

ভোরের বেলা নীচে নামিয়া আসিয়া স্বর্ণ স্নানাগারে গেল। কেহ কিছু বলিল না, কিছু লক্ষ্য করিল না। আহারাদির পর দরজায় খিল দিয়া শুইল। দুই এক জন ননদ ও জা মুখ টিপিয়া একটু হাসিল, বলিল, "রাত্রে বুঝি ভাল ঘুম হয় নাই!" রাত্রে কি হইয়াছিল তাহারা কিছু জানে না।

দরজা দিয়া স্বর্ণ ত ঘুমাইল না, ঘুম তাহার চক্ষু ত্যাগ করিয়া যেন কোথায় চলিয়া গিয়াছিল। খানিকক্ষণ বসিয়া ভাবিল, তাহার পর চিঠির কাগজ লইয়া এক খানা চিঠি লিখিতে বসিল। কলমে কালি তুলিয়া যখন লিখিতে আরম্ভ করিবে, তখন মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। সেখানে ত কেহ ছিল না তবে এত লজ্জা কেন? লজ্জার কারণ এই যে যাহাকে পত্র লিখিতেছিল

তাহাকে আজ পর্য্যন্ত কখন লিখে নাই। আরও কি লজ্জার কারণ ছিল না? সে কথা তখন স্বর্ণের মনেই হয় নাই। সে অনেক ভাবিয়া এই কয়টী কথা লিখিল, "আজ রাত্রি ১১ টার সময় রাণীর বাগানে আসিবে, বিশেষ আবশ্যক আছে।—স্বর্ণ।" হেমন্তকুমারের ঠিকানা স্বর্ণের নিকট লেখা ছিল, পত্র বন্ধ করিয়া স্বর্ণ শিরোনামা লিখিল। তাহার পর দরজা খুলিয়া একজন বিশ্বস্ত দাসীকে ডাকিয়া তাহার হাতে চিঠি দিল। দাসী গিয়া চিঠি ডাকে ফেলিয়া দিল।

রাত্রে সকলে আহারাদি করিয়া শয়ন করিলে কান্তিচন্দ্র আস্তে আস্তে শয়নাগারে গেল। মনে কিছু লজ্জা, কিছু অনুতাপ, কিন্তু অনুতাপটা অত্যন্ত অস্পষ্ট। মনে করিয়াছিল যে, আজ আর স্বর্ণকে অধিক কিছু বলিবে না, যদি স্বর্ণ মার্জ্জনা প্রার্থনা করে তাহা হইলে—হয়ত—মার্জ্জনাও করিবে। কিন্তু স্বয়ং অপরাধ স্বীকার করিয়া যে মার্জ্জনা চাহিবে এ কথা কান্তিচন্দ্রের মনে একবারও উদিত হয় নাই। তাহা হইলে পুরুষ কি? গৃহে প্রবেশ করিয়া কান্তিচন্দ্র শয্যার দিকে চাহিয়া দেখিল—সেখানে স্বর্ণময়ী নাই! গৃহের চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, স্বর্ণময়ী কোথাও নাই! দরজা খুলিয়া বাহিরে উঁকিঝুঁকি মারিয়া দেখিল, কোন খানে স্বর্ণময়ীকে দেখিতে পাইল না! এ সম্ভাবনা কান্তিচন্দ্রের মনে একেবারেই উপস্থিত হয় নাই। স্ত্রীলোকের মনে যে এতক্ষণ রাগ থাকিতে পারে তাহা সে জানিত না। কেন, তাহার

ত রাগ পড়িয়া গিয়াছিল! স্বর্ণ নিশ্চয়ই রাতের ঘটনা কাহাকেও বলিয়া থাকিবে। কান্তিচন্দ্র কো[illegible] না দেখিতে পাইয়া দরজা ভেজাইয়া শয়ন করিল

স্বর্ণ কাহাকেও কিছু বলে নাই। যেমন প্রত্যহ শুইতে যায় সেইরূপ শুইতে গিয়াছিল। কান্তিচন্দ্রের আসিবার কিছু পূর্ব্বে নিঃশব্দে দ্বার খুলিয়া বাহির হইয়া গিয়াছিল। খিড়কীর দরজায় যাইতে একটা অন্ধকার গলি। সেইখানে গিয়া অন্ধকারে স্বর্ণ দাঁড়াইয়া রহিল। ঘড়ীতে ঢং ঢং করিয়া দশটা বাজিল—স্বর্ণ দাঁড়াইয়া রহিল। নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বক্ষের ভিতর হৃদয় সবলে আঘাত প্রতিঘাত করিতে লাগিল, কিন্তু স্বর্ণ প্রস্তরমূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া রহিল। অবশেষে খিড়কীর দরজা সাবধানে খুলিয়া বাড়ীর বাহিরে আসিল। প্রথমে বাহিরে আসিয়া সে অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। তাহার মুখে, বক্ষে, পৃষ্ঠে যেন সূচী বিদ্ধ হইতে লাগিল। পথের পার্শ্বের অন্ধকার দিয়া স্বর্ণ চলিতে লাগিল। অল্প পথ চলিয়াই বাগানে প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিয়াই দেখে সম্মুখে হেমন্তকুমার! পশ্চাতে একটা বৃক্ষের তলায় অন্ধকার। স্বর্ণময়ী গিয়া সেইখানে দাঁড়াইল। হেমন্তকুমার তাহার পার্শ্বে আসিয়া বলিল, "তুমি এ কি করিয়াছ? এখানে তুমি কেন?"

এ কিরূপ সম্ভাষণ! হেমন্তকুমার কি শত বার মনে করে নাই এই রূপ করিয়া কোন দিন স্বর্ণময়ীর সহিত সাক্ষাৎ হইবে?

এক দিকে আর সব, সমাজের নিষ্ঠুর, অন্ধ শাসন, স্বার্থপর গুরু-জন, নির্ম্মম ক্রিয়াকলাপ, অপর দিকে বলবৎ, স্বাধীনহৃদয় প্রেম—এ কল্পনা যে হেমন্তকুমার কত বার করিয়াছিল তাহার ত সংখ্যা করা যায় না। সেই দীর্ঘবাঞ্ছিত মুহূর্ত্ত ত অবশেষে উপস্থিত হইয়াছে। এখন আর অন্য কথার আবশ্যক কি, বিস্ময় অনু-যোগের আবশ্যক কি? এই ত সকল বন্ধন শাসন হইতে মুক্ত হইয়া স্বর্ণময়ী সর্ব্বত্যাগিনী হইয়া তাহার সম্মুখে উপস্থিত হই-য়াছে, এখন আবার কিসের জন্য পশ্চাত্তাপ? স্বর্ণময়ী যখন হেমন্তকুমারের পার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে তখন আর কাহাকে ভয়, কিসের ভয়? সংসারের, সমাজের লাঞ্ছনা দুর্নাম হেমন্তকুমারের কি করিবে? যাহাকে পাইলে সে আর কিছুই প্রার্থনা করে না সেই ত স্বয়ং উপযাচিকা হইয়া তাহাকে আত্ম-সমর্পণ করিতে আসিয়াছে!

যে আকাঙ্ক্ষা দুষ্পূরণীয়, যে অপ্রাপ্য, তাহার কল্পনা, তাহার স্বপ্ন অত্যন্ত চিত্তবিনোদন। কিন্তু স্বপ্ন সত্যে পরিণত হইলে অনেক সময় বিপদ উপস্থিত হয়। হেমন্তকুমার এতদিন যাহা স্বপ্ন দেখিতেছিল, দূরে অস্পষ্ট ছায়ার মত যাহা কখন সমুদিত হইত কখন অন্তর্হিত হইত, আজ তাহা সত্যস্বরূপ হইয়া কঠিন প্রস্তরের ন্যায় তাহার ললাটে আঘাত করিল। সে ব্যথিত, বিহ্বল হইয়া দাঁড়াইল।

অদূরে, অন্ধকারে, দীঘির স্থির জলে নক্ষত্র জ্বলিতেছিল।

স্বর্ণ ধীরে ধীরে সেই জলের দিকে গেল। হেমন্তকুমার তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল। স্বর্ণ বলিল, "আমি এমন সময় এখানে এসেচি বলে তুমি রাগ কোরেচ?"

রাগ—কি কি, হেমন্তকুমার নিজেই বুঝিতে পারিতেছিল না। এ পর্য্যন্ত তাহার বিস্ময়ই দূর হয় নাই। কিছু চমকিত হইয়া বলিল, "না, না, রাগ কেন?"

হেমন্তকুমার যেমন বিস্মিত ও বিচলিত হইতেছিল, স্বর্ণ তেমনি স্থির ও নিশ্চিন্তের মত হইতেছিল। হেমন্তকুমার কত কি আকাশ পাতাল ভাবিতেছিল, স্বর্ণময়ী পদতলে শান্তি এবং নিশ্চিন্ততা দেখিতেছিল। স্বর্ণময়ী মৃদু মৃদু, বড় মধুর স্বরে বলিল, "মনে পড়ে? আর এক দিন এমনি ধারা, পুকুর ধারে, বিকেল বেলা?"

তন্মুহূর্ত্তে সেই মধুময়ী স্মৃতিতে বর্ত্তমান বিলুপ্ত হইল। হেমন্তকুমার বলিল, "মনে পড়ে না! সে দিন কি কখন ভুল্‌ব?"

স্বর্ণময়ী বলিতে লাগিল, "মনে পড়ে, আমি ডুব্‌তে চেয়েছিলাম। তখন দিনের বেলা, চারি দিকে লোক জন, হয়ত দেখ্‌তে পেত, হয়ত আমায় তুলে ফেল্‌ত। সে বড় লজ্জার কথা! তখন দুঃখও দূরে ছিল। এখন দেখ, অন্ধকার, কেহ কোথাও নেই, এখন পথে বাহির হয়ে লজ্জার মাথা খেয়েছি, এখন আর কিসের ভয়? আমি এই খানে আছি, তুমি যাও। না হয় তুমি দাঁড়িয়ে থাক, আমি তোমার সাক্ষাতে ডুবি, তুমি ত আর কাউকে বল্‌তে যাবে না!"

এই হৃদয়বিদারক বাক্য শ্রবণ করিয়া হেমন্তকুমার আর আত্ম-সংযম করিতে পারিল না। প্রেমের উচ্ছ্বসিত বন্যা আসিয়া আর সব ভাসাইয়া লইয়া গেল। সে ত্রস্তে স্বর্ণময়ীকে হৃদয়ে তুলিয়া লইয়া জলের নিকট হইতে সরিয়া আসিল—যেন তাহার ভয় হইল যে, সেই বিশাল হৃদয় জলরাশি বলপূর্ব্বক স্বর্ণময়ীকে গ্রহণ করিয়া আপনার শীতল, প্রশান্ত, অগাধ হৃদয়ে ধারণ করিবে। হেমন্তকুমার স্বর্ণময়ীকে হৃদয়ে ধারণ করিল, তাহার মুখ চুম্বন করিল, বলিল, "আবার ওই কথা! আর ও রকম কথা কেন? এখন আমরা এক দিকে—আর সমস্ত পৃথিবী এক দিকে। এখন আর কাকে ভয়? এখন তোমার জীবন মরণ আমাকে লাগে, ও কথা তুমি আর মুখে আনিও না। এখন উঠ, বাড়ী চল।"

স্বর্ণময়ী কি ভাবিতেছিল? অধিক ভাবিবার সে সময় তাহার অবস্থা ছিল না। হেমন্তকুমার তাহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া সান্ত্বনা করিতেছে, আর ভাবনার কারণ কি? দেখ, ঐ নক্ষত্রা-লোকিত অন্ধকার আকাশে কি গভীর শান্তি, স্থির জলরাশিতে কেমন স্নিগ্ধ শান্তি, নিশীথের নিস্তব্ধতায় কেমন অনির্ব্বচনীয় শান্তি! হেমন্তকুমারের সান্ত্বনায় স্বর্ণময়ীর হৃদয়ে সেইরূপ শান্তি প্রবেশ করিল। আলস্যের সহিত কহিল, "চল!"

কোথায় যাইবে? কোথায় বাড়ী? কলিকাতার বাসা বাড়ীতে হেমন্তকুমার এত রাত্রে এই কিশোরী-যুবতীকে লইয়া

যাইবে, না গ্রামে ভিটায় লইয়া যাইবে? যে প্রেম-বন্যা এত জোরে তাহার হৃদয়ের বেলাভূমিতে ডাকিয়াছিল সে বন্যা সেই রূপ সহসা সরিয়া গেল। হেমন্তকুমার ভাবনায় আকুল হইল। ভাবিবার একটু অবকাশ পাইবার জন্য স্বর্ণকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এ রকম কোরে হঠাৎ চলে এলে কেন?"

স্বর্ণ মৃদু মৃদু, প্রায় অস্ফুট স্বরে বলিল, "আমায় লাথি মেরেছিল।"

আবার সে বন্যা বড় জোরে ডাকিল। তাহার উপর শোণিতে হুতাশন জ্বলিয়া উঠিল। হেমন্তকুমার বলিল, "কি! কান্তি তোমার গায় হাত তুলেছে?"

স্বর্ণ সংশোধন করিয়া দিল, "হাত নয়, পা।"

হেমন্তকুমার স্বর্ণকে আরও নিকটে টানিয়া লইল—যেন সে ব্যতীত তাহাকে রক্ষা করিবার আর কেহ নাই। মনে মনে আবার বলিল, "স্বর্ণ আর আমি এক দিকে—আর সমস্ত পৃথিবী আর এক দিকে।"

রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর হইয়াছিল। রাত্রি অধিক হয় দেখিয়া হেমন্তকুমার স্বর্ণের হস্ত ধারণ করিয়া উঠিল। বাগানের বাহিরে নিকটেই একটা পাল্কীর আড্ডা। উড়ে বেহারারা সারাদিন খাটিয়া বড় ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, প্রথমে উঠিতে চায় না, অবশেষে অধিক ভাড়ার প্রলোভন দেখাইয়া হেমন্তকুমার তাহাদিগকে উঠাইল। স্বর্ণময়ীকে একান্তে বলিল, "দেখ, আজ এত রাত্রে

আর কোথাও যাইবার জায়গা নাই। আমি এখানে বাসায় থাকি, সেখানে অন্য লোক থাকে। এখন তোমায় তোমার মামার বাড়ী লইয়া যাই, তার পর একটা কিছু ঠিক করিয়া তোমায় লইয়া যাইব।"

স্বর্ণ প্রথম পিছাইল। "কোন্ মুখে আমি এমন কোরে মামার বাড়ী যাব। তাঁরা আমায় দূর কোরে দেবেন।"

হেমন্তকুমার বলিল, "আসল কথা এখন কেউ জানিতে পারিবে না। এই পর্য্যন্ত সকলে জানিবে যে তুমি নিজে চুপি চুপি পলাইয়া আসিয়াছ। সে জন্য হয়ত তোমার উপর রাগ করিবে। এখন আর কোন ভয় নাই।"

স্বর্ণ বলিল, "কিন্তু মামার বাড়ী আগেকার মত আর থাক্‌বো না। আমি সেখানে বেশী দিন থাক্‌তে পার্‌ব না।"

হেমন্তকুমার বলিল, "থাকিবার কোন আবশ্যক হবে না। আমি শীঘ্রই একটা উপায় করিব।"

স্বর্ণময়ী মাতুলালয়ে চলিয়া আসিল। সদর দরজা মুক্ত ছিল, স্বর্ণ অলক্ষ্যে বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিল। প্রভাতে একটা ভয়ানক গোলযোগ উঠিল। স্বর্ণময়ী কাহাকেও কোন কথা বলিল না, কেবল মাতাকে বলিল, "আমি সেখানে থাক্‌তে পারি নি তাই একা পালিয়ে এসেছি। আবার যদি আমায় পাঠাবার কথা তোল ত আমি গলায় দড়ী দিয়ে মর্‌ব।"

এ আশঙ্কা অমূলক। শ্বশুরালয়ে যখন প্রকাশ লইল যে স্বর্ণ

রাত্রে একা মামার বাড়ী পলাইয়া গিয়াছে তখন কলঙ্ক স্থান রহিল না। কান্তিচন্দ্রের পিতা ও মাতা বলিয়া পাঠাইলে যে, বধূকে যেন আর না পাঠান হয়, কেননা ভদ্র ঘরের মেয়ের এরূপ আচরণ নহে। তাঁহারা পুত্রের অন্য বিবাহ দিবেন।

প্যারীমাধবও এরূপ অখ্যাতি লইতে স্বীকার করিলেন না। স্বর্ণময়ীর মাতাকে বলিলেন, "যাহা ঘটিয়াছে তাহার পর আর স্বর্ণকে এখানে রাখিতে পারি না। তুমি উহাকে লইয়া গিয়া গ্রামে বাস কর।"

স্বর্ণময়ীর মাতার মুখ বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। তিনি চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে কন্যাকে লইয়া গ্রামে চলিয়া গেলেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

গোবিন্দ চন্দ্র যে দীনবন্ধুকে বলিয়াছিলেন যে, যে স্বয়ং অধঃপাতে যাইতেছে সে অপরকে কি পরামর্শ দিবে, সেটা বিদ্রূপের কথা নয়। বয়সের সঙ্গে গোবিন্দচন্দ্রের আরও চিত্তশৈথিল্য জন্মিতেছিল। ইদানী বড় বাড়াবাড়ি করিয়া তুলিয়াছিলেন। স্ত্রী সুকুমারী আর কোন মতে তাঁহাকে বুঝাইতে পারিতেন না। স্ত্রীর সাক্ষাতে বলিতেন সব দোষ ত্যাগ করিবেন, বন্ধুদিগের পাল্লায় পড়িলে আবার যে কে সেই। অপরিমিত পানদোষে মস্তিষ্কের কিছু দোষ হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। কাজকর্ম্মে আর তেমন মন নাই, মধ্যে মধ্যে ভুলও হইত। এ জন্য এ পর্য্যন্ত প্রকাশ্যে তাঁহাকে কোন কথা শুনিতে হয় নাই, কিন্তু কটাক্ষে ইঙ্গিতে কথাটা উঠিয়াছিল।

একদিন রবিবারে সন্ধ্যার সময় কয়েকজন বন্ধু তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া গেল। এরূপ সর্ব্বদাই ঘটিত। সুকুমারী প্রায় রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত স্বামীর পথ দেখিয়া অবশেষে শয়ন করিলেন।

গোবিন্দচন্দ্রকে যেখানে লইয়া গেল সেখানে নৃত্যগীত হইবার কথা ছিল, কিন্তু সে দিকে কাহারও বড় মন ছিল না। পানাহারে সকলে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। যে দু এক জন নর্ত্তকী

আসিয়াছিল তাহাদেরও সেই দশা। রাত্রি কিছু অধিক হইলে গোবিন্দচন্দ্র অতিরিক্ত পান করিয়া জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িলেন। বন্ধুদিগের মধ্যে দুই জন কিছু শক্ত মাতাল ছিল, সহজে টলে না। গোবিন্দচন্দ্রকে নেশায় অচৈতন্য দেখিয়া দুই জনে পরামর্শ করিল, একটা মজা করিতে হইবে। পরামর্শ স্থির করিয়া তাহারা একটা বেশ্যাকে ক্রমাগত সুরা পান করাইতে লাগিল। দুই এক দণ্ড পরে সেও অজ্ঞান হইয়া পড়িল। দুই বন্ধুতে মিলিয়া তখন তাড়াতাড়ি গাড়ী ডাকাইল। তখন রাত্রি প্রায় তিনটা হইবে। বন্ধুদ্বয় মিলিয়া গোবিন্দচন্দ্রকে এবং সেই বেশ্যাটাকে ধরাধরি করিয়া গাড়ীতে তুলিল। তাহাদের আদেশ মত গাড়ী গিয়া গোবিন্দচন্দ্রের দ্বারে উপস্থিত হইল। দুই জন পূর্ব্বের মত ধরাধরি করিয়া দুইজনকে বৈঠকখানায় তুলিল। তাহাদের ধমক চমকে ভৃত্যেরা কেহ সম্মুখে আসিল না। বন্ধুদ্বয়ের মধ্যে একজন হাঁক দিয়া বলিল, "বাবুকে উঠাস্ নে, ঘুমাচ্চে।" বৈঠকখানার দরজা বাহির হইতে বন্ধ করিয়া দিয়া দুই জনে অত্যন্ত কৌতুক অনুভব করিতে করিতে গাড়ী হাঁকাইয়া চলিয়া গেল।

প্রত্যূষে, অন্ধকার থাকিতে সুকুমারী উঠিয়া, উদ্বিগ্ন চিত্তে দাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাত ত ফুরিয়ে গেল, উনি এখনও বাড়ী এলেন না?"

দাসী উঠিল। বলিল, "আমি দেখ্‌ছি।"

যতটা ভাবনা সুকুমারীর হইয়াছিল, দাসীর ততটা হইবার

কথা নহে। সে ধীরে সুস্থে উঠিয়া, মুখ হাত ধুইয়া, দরজা খুলিয়া বাহির বাটীতে গেল। সুকুমারী লজ্জায় পড়িয়া আর তাহাকে তাড়া দিতে পারিলেন না। দাসী যখন বাহিরে গেল তখন বেশ পরিষ্কার হইয়াছে। খানিকক্ষণ বাহিরে কিছু গোল-মাল হইল, তাহার পর সুকুমারী শুনিলেন, দাসী দরজার বাহিরে বলিতেছে, "ছি! ছি! ছি! কি ঘেন্নার কথা!"

অন্দর মহলের একটা দালান পার হইয়া বৈঠকখানায় যাওয়া যায়। সুকুমারী সেই দিক দিয়া বৈঠকখানার অভিমুখে গমন করিলেন। দরজাগোড়ায় গোবিন্দচন্দ্রের ভৃত্য দাঁড়াইয়া-ছিল। সে তাঁহাকে দেখিয়া দ্বার রোধ করিয়া দাঁড়াইল। সুকুমারী প্রথমে তাহা লক্ষ্য করিলেন না। জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েচে? ঝি কি বল্‌চে?"

ভৃত্য মহা বিপদে পড়িল, আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিল, "না, কিছু হয় নি। তা, আপনি বাড়ীর ভিতর যান, আমরা বাবুকে দেখে আসি।"

বলিয়া ভৃত্য চুপ করিল। সুকুমারীও কোন কথা কহিলেন না। গোল থামিয়া গেল। সেই স্তব্ধতায় বৈঠকখানায় নাসাধ্বনি হইল। সুকুমারী চমকিয়া উঠিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও কি! বৈঠকখানায় কে ঘুমাচ্চে?"

ভৃত্যের বিপদ বাড়িল, তাহার মুখ শুষ্ক হইয়া গেল। ঢোক গিলিয়া বলিল, "আজ্ঞে, আমি দেখে আস্‌চি," বলিয়া

দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার ভয় যদি স্বকুমারী তাহার পশ্চাৎ গৃহে প্রবেশ করেন।

স্বকুমারী বলিলেন, "সরে যা, আমি দেখ্‌চি। বৈঠকখানায় এত বেলা পর্য্যন্ত কে ঘুমায়?"

ভৃত্য তবু সরেনা, বলে, "আজ্ঞে, বাবু বুঝি অনেক রাত্রে এসে ঘুমিয়েচেন—তা—এখন—আপনি না গেলেই ভাল হয়।"

তখন স্বকুমারী রাগিয়া উঠিলেন। "ভাল মন্দ বিচার কর্‌বার তুই কে রে? পথ ছেড়ে দে!"

আর পথ রোধ করিতে ভৃত্যের সাহস হইল না। পথ ছাড়াইয়া দাঁড়াইল, তথাপি বলিল, "আজ্ঞে, এ ঘরে এখন না গেলে ভাল হত।"

স্বকুমারী গৃহে প্রবেশ করিলেন। ভৃত্য উর্দ্ধশ্বাসে সে স্থান হইতে পলায়ন করিল।

গৃহে প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে স্বকুমারীর হৃদয়ে অশনিসম্পাতের ন্যায় আঘাত লাগিল।

গোবিন্দচন্দ্র গালিচার উপর শয়ান রহিয়াছেন; তাঁহার পার্শ্বে বারাঙ্গনা নিদ্রিত। উভয়ের বেশ বাস স্খলিত, সুরাপানে মুখ লোহিত বর্ণ, মুখের উপর মাছি উড়িতেছে।

স্বকুমারী প্রাণশূন্য পাষাণপ্রতিমার ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন।

গোবিন্দচন্দ্র পূর্ব্বমুখ হইয়া শয়ন করিয়াছিলেন। সূর্য্যোদয় হইলে শাসী গলিয়া তাঁহার মুখে আলোক পতিত হইল। চক্ষে

আলোকরশ্মি লাগিয়া তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। লোহিত চক্ষুদ্বয় মুছিতে মুছিতে উঠিয়া বসিলেন। মস্তকে অত্যন্ত বেদনা, তখনও মস্তকের তেমন স্থিরতা নাই। চাহিয়া দেখেন সম্মুখে দাঁড়াইয়া—সুকুমারী! এ স্থানে কেমন করিয়া আসিলেন, কখন আসিলেন! গৃহের চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন—এ ত তাঁহার নিজের বৈঠকখানা! রাত্রে কখন আসিলেন? এখানে কেন শয়ন করিয়া আছেন? সুকুমারী এরূপ করিয়া গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়া কেন? এদিক ওদিক চাহিতে পার্শ্বে দৃষ্টি পড়িল। সর্ব্বনাশ! তাঁহার পার্শ্বে এরূপ করিয়া শয়ন করিয়া এ কে?

গোবিন্দচন্দ্র লজ্জায় অধোবদন হইলেন।

সুকুমারী তখন বিনা বাক্যে, ধীর গতিতে, বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেলেন।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

আফিসে যাইবার পূর্ব্বে গোবিন্দচন্দ্র স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না। আফিসে গিয়া এক মাসের ছুটী লইলেন। সাহেবকে বলিলেন, ছুটী ফুরাইলে কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পেন্সন লইবেন। সাহেব কারণ জিজ্ঞাসা করাতে বলিলেন, শরীর খারাপ হইতেছে আর তেমন পরিশ্রম করিতে পারেন না। বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া বৈঠকখানায় একা বসিলেন। ভৃত্যদের আদেশ করিলেন যেন কেহ সে ঘরে না আসিতে পায়।

ঘরে বসিয়া গোবিন্দচন্দ্র ভাবিতে লাগিলেন। এত বিদ্যা, এত বুদ্ধি, এত যশ, এই কি তাহার পরিণাম হইল? প্রথম প্রথম একটু আধটু মদ খাইতেন আমোদের জন্য, স্ফূর্ত্তির জন্য। তখন শরীরের তেজ, মনের তেজ ছিল, মনে কত আশা, কত কল্পনা ছিল, দেশের জন্য কত উৎসাহ ছিল। উচ্চ স্থানে উপবিষ্ট হইয়া চারিদিক নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতেন। দুই এক পদ অবতরণ করিয়া কৌতুক অনুভব করিতেন, মনে করিতেন আবার যখনই ইচ্ছা হইবে আরও উর্দ্ধে উঠিয়া যাইবেন। কৈ, তা ত হইল না! যত নীচে যান ততই পিচ্ছিল, উপরে উঠা ততই অসম্ভব হইয়া উঠিল। অবশেষে আর স্বেচ্ছায় নামিতে হইল

না, পদস্খলন হইয়া পতন হইল। পতনের বেগ ক্রমে বাড়িতে লাগিল, অবশেষে ভয়ঙ্কর পূতিগন্ধবিশিষ্ট পঙ্কময় নরকে পতিত হইলেন। সেই শেষ পতনের সাক্ষী পবিত্রস্বভাব ভার্য্যা সুকুমারী স্বয়ং। সতী সাধ্বী স্বচক্ষে দাঁড়াইয়া স্বামীর সেই অবস্থা দেখিয়াছিলেন, দেখিয়া প্রস্তরবৎ নিস্পন্দ হইয়াছিলেন। গোবিন্দচন্দ্র যেরূপ আচরণ করিতেছিলেন তাহাতে পত্নীর মনে কত কষ্ট হইতেছে তিনি বুঝিতে পারিতেন না। তিনি ভাবিতেন, তিনি ত স্ত্রীকে কোনরূপ কষ্ট দেন না, তবে পুরুষ মানুষ অল্প স্বল্প আমোদ আহ্লাদ করিয়াই থাকে। কিন্তু এবার আর তেমন করিয়া মনকে বুঝাইতে পারিলেন না। সুকুমারী কি মনে করিতেছেন ? হয়ত তিনি জানিয়াছেন যে, গোবিন্দচন্দ্র বেশ্যাসক্ত হইয়া, উপপত্নী লইয়া, স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বৈঠকখানায় শয়ন করিয়াছিলেন ! গোবিন্দচন্দ্র কেমন করিয়া স্ত্রীকে বুঝাইবেন যে, স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বা জ্ঞানে তিনি এমন অপরাধ করেন নাই ? সুকুমারীই যেন বুঝিলেন, তিনি নিজের মনকে কেমন করিয়া বুঝাইবেন ? তাঁহার কিসের অভাব যে তিনি এতকাল ধরিয়া এমন পশুবৎ আচরণ করিয়া আসিতেছেন ? পশুবৎ ! কোন্ পশুতে এরূপ আচরণ করিয়া থাকে ? স্বভাবের নিয়ম কোন্ পশুতে অতিক্রম করে ? অভাব নাই বলিয়াই গোবিন্দচন্দ্র একটু আধটু আমোদ আহ্লাদ করিয়াছিলেন। কিন্তু এ কি রকম আমোদ ? তীব্রবিষ হলাহল পান করিয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যজ্ঞানশূন্য উন্মত্ততার নাম

কি আমোদ? এই কি আমোদ যাহাতে শরীর যায়, বুদ্ধিভ্রংশ হয়, লজ্জা, অপমান জ্ঞান, সব যায়? মনুষ্যের দুর্লভ বুদ্ধিকে গরল দিয়া নাশ করা কি আমোদ? কোন্ পশুতে এরূপ আমোদ করিয়া থাকে?

কোন কোন সময় তর্কের মুখে গোবিন্দচন্দ্র বলিতেন যে, যে জাতির কোন আশা ভরসা নাই, যাহাদের উন্নতির কোন উপায় নাই, সে জাতি উৎসন্ন যাওয়াই ভাল। আমরা সেই রূপ জাতি, অতএব আমরা যে কোন উপায়ে উৎসন্ন যাই তাহাতে কোন আপত্তি নাই। এই বা কি রূপ যুক্তি? কে বলিল যে আমরা একেবারেই উৎসন্ন যাইতেছি? কে জানে ভবিষ্যতে কি হইবে? বহু ক্ষমতাপন্ন কত জাতি কত কীর্ত্তি করিয়া একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে। ভারতবাসী সে সকল জাতি অপেক্ষাও প্রাচীন কিন্তু এ পর্য্যন্ত ত বিলুপ্ত হয় নাই। বহুকাল অত্যন্ত দুরবস্থা হইয়াছে সত্য বটে, কিন্তু চিরকাল এই অবস্থাই থাকিবে কে বলিতে পারে? জাতির কথা ছাড়িয়া দাও; প্রত্যেক মনুষ্যে কি ব্যক্তিগত মহত্ত্ব নাই? মানুষ মাত্রেই মহচ্চরিত্র হইতে পারে না, দুশ্চরিত্রেরই সংখ্যা অধিক, কিন্তু যে পারে সেও কি চেষ্টা করিবে না? নহিলে, মানবজন্ম হইল কেন? মানুষে মানুষে প্রভেদ কেন? এক জন শিক্ষিত আর এক জন বর্ব্বর কেন? গোবিন্দচন্দ্রের শিক্ষা অসাধারণ, বুদ্ধি সূক্ষ্ম, তিনি এ সকল লইয়া কি করিলেন? মদ খাইবার ও বেশ্যার সহিত জঘন্য কথোপকথন

করিবার জন্য কি বিদ্যাবুদ্ধির দরকার? একটা মুটে মজুর হয়ত উভয় কার্য্যেই অধিকতর পটু, কিন্তু অর্থাভাবে সে দুইয়ের একটাও করিতে পারে না! গোবিন্দচন্দ্রের বিদ্যার্জ্জিত পূর্ব্ব কথা মনে হইল। এ দেশ ত অসদাচারের স্থান নহে। ধর্ম্মের, সাধনার, বিদ্যার, সর্ব্বাঙ্গীন উচ্চ শিক্ষার তীর্থ স্বরূপ এই পুণ্যভূমি। দেশে দেশে ভ্রমণ করিলে কত আমোদ অনুভব করিতে পারা যায়! তীর্থ স্থানে কেমন শুদ্ধানন্দের উদয় হয়! নিসর্গের কি অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য! এত দিন গোবিন্দচন্দ্র এমন মানব জীবন লইয়া, এত বিদ্যা বুদ্ধি লইয়া কি করিলেন? মনে মনে গোবিন্দচন্দ্র আপনাকে শত শত ধিক্কার দিতে লাগিলেন।

সুকুমারী কি ভাবিতেছিলেন? তাঁহার ভাবনা অকূল সমুদ্রের মত, কোথায় তাহার কিনারা পাইবেন? এতদিন ভাবনার সঙ্গে ভরসা ছিল, মনে করিতেন, কোন দিন না কোন দিন স্বামীর সুমতি হইবে, অসচ্চরিত্র বন্ধুদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ করিবেন। সে ভরসা এখন একেবারে ভাঙ্গিয়া গেল। যত দিন মানুষের চক্ষু লজ্জা থাকে তত দিন সব আশা থাকে। সে লজ্জা একবার দূর হইয়া গেলে আর ফিরিবার কোন আশা থাকে না। যখন গোবিন্দচন্দ্র স্ত্রীর বুকের উপর বসিয়া আপনার গৃহে এইরূপ করিতে আরম্ভ করিলেন তখন আর বাকি রহিল কি? সেই ঘোর বিপদের সময় সুকুমারী জগদীশ্বরকে স্মরণ করিলেন। দৃঢ়চিত্ত, অবিশ্বাসপূর্ণহৃদয় পুরুষও বিপদের সময় সর্ব্ববিঘ্ন-

বিনাশন বিপদভঞ্জনকে স্মরণ করে, অবলা নারী তাঁহার ভিন্ন আর কাহার আশ্রয় গ্রহণ করিবে? বহুদর্শী, বর্ষীয়ান্ ঈশ্বরচন্দ্র সুকুমারীকে বলিয়াছিলেন, "মা, জগদীশ্বরকে ডাকিও, তিনি তোমার দুঃখ দূর করিবেন।" সুকুমারী এক মনে, কাতর প্রাণে জগদীশ্বরকে ডাকিতে লাগিলেন। স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছিলেন তাহাতে মরিতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু সুকুমারী মৃত্যুকে ডাকিলেন না, মরিবার কামনা করিলেন না। সেই বিপদের সময়ও স্বামীর চিন্তাই প্রধান চিন্তা। স্বামী আগে তিনি পরে। তিনি বুঝিতেছিলেন যে, যেমন বিপদ তাঁহার, স্বামীর বিপদও সেই রূপ। এমন সময় যদি তিনি আত্মহত্যা করেন কিম্বা স্বামীকে ত্যাগ করিয়া পিত্রালয়ে গমন করেন তাহা হইলে স্বামীর দশা কি হইবে? এ সময় দুঃখমোচন মধুসূদন ভিন্ন আর কাহাকে ডাকিবেন? সুকুমারী সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহাকেই ডাকিতে লাগিলেন।

সন্ধ্যার পর অন্ধকার হইলে গোবিন্দচন্দ্র বাড়ীর ভিতর আসিলেন। আলোকিত শয়নকক্ষে সুকুমারীকে দেখিতে পাইলেন না। কক্ষের বাহিরে দেখিলেন অন্ধকারে সুকুমারী বসিয়া আছেন। অন্ধকারে বসিয়া ভগবানের পদারবিন্দে বার বার প্রণিপাত করিতেছেন। গোবিন্দচন্দ্র কিয়ৎকাল নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া পরে কহিলেন, "তুমি কি আমার সঙ্গে আর কথা কহিবে না?"

স্বামীর কথা শুনিয়া সুকুমারী দরবিগলিত চক্ষু মুছিয়া উঠিয়া

বসিলেন। স্বামীর দিকে চাহিয়া কহিলেন, "কেন, তুমি আমার স্বামী, আমার দেবতা, তোমার সহিত কথা কহিব না কেন?"

ভৎর্সনা গঞ্জনা শুনিলে বরং গোবিন্দচন্দ্র স্থির থাকিতে পারিতেন। কিন্তু সাধ্বীর ভক্তিপূর্ণ কথায় তাঁহার চক্ষু বাষ্পপূর্ণ হইল। বাষ্পবিকৃতস্বরে কহিলেন, "আজ তোমায় সারাদিন দেখি নাই, তাই মনে হইতেছিল যে বুঝি আমার নিকটে আর আসিবে না।"

সুকুমারী বলিলেন, "তুমি ত আমায় ডাক নাই, আমার সহিত ত দেখা করিতে চাহ নাই।"

গোবিন্দচন্দ্র নিরুত্তর হইলেন। দুই জনে নীরবে রহিলেন। গোবিন্দচন্দ্র আবার কথা কহিলেন, বলিলেন, "একটা কথা তোমাকে বলিতে আসিয়াছি, না বলিয়া স্থির হইতে পারিতেছি না।"

"কি কথা, বল।"

"আমার কথা বিশ্বাস করিবে কি?"

সুকুমারীর স্বর অশ্রুপূর্ণ হইল। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, "আমি কি কখন তোমার কথায় অবিশ্বাস করিয়াছি?"

"তুমি যাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছ তাহাই অবিশ্বাস করিতে বলিতেছি। আমি মদ খাইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলাম। স্ত্রীলোকটাকেও মদ খাওয়াইয়া অজ্ঞান করিয়াছিল। সেই অবস্থায় আমাকে তুলিয়া আনিয়া বৈঠকখানায় ফেলিয়া যায়। আমি ইহার কিছু জানি না। এ কথা তোমায় সত্য বলিলাম।"

"তোমার কথায় আমার অবিশ্বাস নাই, কিন্তু আমাকে এ কথা বলিয়া কি হইবে ?"

"সে কথা এখন তোমাকে কোন্ মুখে বুঝাইব ? আমি যদি বলি যে তোমাকে লইয়াই আমার সব সুখ, আর সব ত্যাগ করিতে পারি তোমার স্নেহ ত্যাগ করিতে পারি না তাহা হইলে কি তুমি আমার কথা বিশ্বাস করিবে ?"

এবার সুকুমারী উত্তর দিলেন না। গোবিন্দচন্দ্র ও নীরব হইলেন।

দ্বিতীয়বারও গোবিন্দচন্দ্রই স্তব্ধতা ভঙ্গ করিলেন। বলিলেন, "আর একটা কথা বলিতে আসিয়াছি।"

"কি ?"

"আমি চাকরী ছাড়িয়া দিব স্থির করিয়াছি।"

সুকুমারী বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন ?"

"এখানে এরূপ করিয়া থাকিলে আমি সঙ্গদোষ ছাড়িতে পারিব না। তোমার যাহাতে কখন কষ্ট না হয় সে উপায় আমি করিয়া রাখিয়াছি। এক মাসের ছুটী লইয়া আপাততঃ যাইতেছি। তাহার পর পেন্সন লইব। কিছু দিন তীর্থে তীর্থে ঘুরিয়া বেড়াইব। তুমি কি আমার সঙ্গে যাইবে ?"

সুকুমারী উঠিয়া স্বামীর হস্ত ধারণ করিলেন। বলিলেন, "সে কথা আবার জিজ্ঞাসা করিতেছ ? আমার কি এখানে বাস করিতে বড় সাধ ?" সুকুমারী স্বামীর হাত আরও চাপিয়া ধরিলেন, বলিলেন, "এখন আমার একটী কথা রাখিতে হইবে।"

গোবিন্দচন্দ্র বলিলেন, "কি করিতে হইবে বল, এখনই করিতেছি।"

সুকুমারী বলিতে লাগিলেন, "আজ সমস্ত দিন আমি কেবল ভগবানকে ডাকিয়াছি, ভাবিয়াছি এমন বিপদ হইতে তিনি নহিলে আর কে উদ্ধার করিবে? আমার সেই প্রার্থনা পূর্ণ হইয়াছে, কারণ তিনি নহিলে কে তোমায় এমন সুবুদ্ধি দিবে? এস, দুই জনে মিলিয়া একবার তাঁহার নাম করি, তাঁহার চরণে ধন্যবাদ দিই।"

সুকুমারী স্বামীর হস্ত সেইরূপ ধারণ করিয়া ভূমিতে সাষ্টাঙ্গ প্রণত হইলেন। গোবিন্দচন্দ্রও সহধর্ম্মিণীর সঙ্গে সেইরূপ ভূমিতে ললাট স্পর্শ করিলেন। দুই জন অনেকক্ষণ এইরূপ রহিলেন। আবার যখন উঠিয়া বসিলেন, তখন সুকুমারীর মুখ আনন্দ-পূর্ণ, গোবিন্দচন্দ্রের চক্ষে অশ্রু বহিতেছে।

গোবিন্দচন্দ্র ছুটী লইয়া সস্ত্রীক তীর্থ পর্য্যটনে যাত্রা করিলেন। কলিকাতায় তাঁহারা আর ফিরিলেন না।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

জগতে অতুলনীয় নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যপূর্ণ কাশ্মীরের উপত্যকা উর্ব্বর করিয়া বিতস্তা বহিতেছে। রাজধানী শ্রীনগরের সম্মুখে নদী অত্যন্ত মন্দস্রোত, অল্প দূর হইতে দেখিলে বহিতেছে কি না বুঝিতে পারা যায় না। জল যেমন মৃদুবাহী সেইরূপ স্থির, তরঙ্গ নাই, ফেণা নাই, শব্দ নাই। অপূর্ব্ব শোভাময়ী প্রকৃতি যেন ক্রোড়ে মুকুর লইয়া অলস ভাবে বসিয়া আপনার অপূর্ব্ব রূপের প্রতিমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিতেছে। জ্যোৎস্নালোকে সেই রজত তরল আরসীতে তীরস্থিত দীর্ঘ, সরল, সুন্দর, সফেদা বৃক্ষশ্রেণী স্থির জলে প্রতিবিম্বিত হইয়া আলোক ও ছায়ার অতি মধুর মায়াময় চিত্র সৃজন করে। জ্যোৎস্নায় নদীবক্ষে তরণীতে কোথাও অলস বিলাস সঙ্গীত, কোথাও মাঝির আনন্দ গীত। এমন স্বচ্ছ, স্থির তড়াগতুল্য নদী কোথাও দেখিতে পাইবে না।

দেখিয়া মনে হয় যে বিতস্তা সেইরূপ করিয়া, মৃদু মৃদু বহিয়া, পর্ব্বতশ্রেণীর অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু নদী স্রোতের সহিত আরও কিছু দূর গমন কর, কি দেখিবে? দেখিবে যে স্রোতের বেগ ক্রমশঃ বাড়িতেছে, কখন তরঙ্গ হইতেছে আবার মিলাইয়া যাইতেছে, সে শান্তচ্ছবি মূর্ত্তি যেন আর

নাই। নদীর কূলে কূলে আরও গমন কর, কি শুনিতে পাইবে? শুনিবে দূরে অবিশ্রাম গম্ভীর গর্জ্জন, যত যাইবে ততই সে শব্দে অন্য শব্দ ডুবিয়া যাইবে, দিগ্বিদিক পরিপূরিত করিয়া সেই গর্জ্জন ধ্বনিতে থাকিবে। সহসা দেখ, নদীর সে প্রসন্ন অলস মূর্ত্তি কোথায় অন্তর্হিত হইল! দুই দিকে দুই পর্ব্বতশ্রেণী পরস্পরের নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, তাহার মধ্যে সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া প্রখরবেগে নদী চলিয়াছে। জল আবিল, ফেনিল, জলে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ডসমূহ নিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, তাহাতে ঠেকিয়া জলে আবর্ত্ত রচিত হইতেছে। ঘোর জলভঙ্গরব, জলবিন্দু বাষ্পাকারে উড়িতেছে, কোথাও পর্ব্বতগহ্বরে বৃহৎ কটাহের মধ্যে ফেণশুভ্র জল ফুটিতেছে। কাহার সাধ্য সে স্থানে নদী পার হইতে সাহস করে? তখন স্তম্ভিত হইতে হয়, জিজ্ঞাসা করিতে হয়, ধীরালস-বাহিনী, উপত্যকাসঞ্চারিণী বিতস্তা কি এই?

মনুষ্যজীবন অনেক সময় এইরূপ। প্রথমে এইরূপ সুখশান্তি-ময়, নয়নের তৃপ্তিকর, অবশেষে এইরূপ ছিন্ন ভিন্ন ভগ্ন চূর্ণ হইয়া যায়। রজনীকান্তের জীবন এই শেষাবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। পূর্ব্বকথা তাহার স্মৃতিপথে আর উঠিত না। সে নিশ্চিন্ত, নিস্তরঙ্গ জীবন, দর্পণবৎ স্বচ্ছ, সে কিশোরী ভার্য্যার কোমল, স্নিগ্ধ প্রণয় বহুদিনবিস্মৃত স্বপ্নের ন্যায় হইয়া উঠিয়াছিল। এখন দিবানিশি তাহার হৃদয়ে ঝটিকা বহিতেছে, বিদ্যুৎ ঝলসি-তেছে। নিশ্চিন্ততা মুহূর্ত্ত মাত্র নাই। সর্ব্বভুক্, লোলায়মান

হুতাশনশিখা তুল্য আতর তাহার সম্মুখে জ্বলিত, বঙ্গিবিবিক্ষু পতঙ্গের ন্যায় রজনীকান্ত সেই অনলে পতিত হইত। কিন্তু এ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হয় নাই! অগ্নিতে একবার পড়িয়া, দগ্ধপক্ষ হইয়া বাহির হইয়া আসিত, আবার ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত; আবার পুড়িত, আবার বাহিরে আসিয়া ঘুরিত; আবার পুড়িত, আবার বাহিরে আসিয়া দেখিত; আবার পুড়িত। পুড়িতেছে কি জুড়াইতেছে সে জ্ঞান ছিল না। একে একে, অল্পে অল্পে দগ্ধ হইতে লাগিল—আগে লজ্জা গেল, তার পর ভয় গেল, তার পর কাণ্ডজ্ঞান গেল।

আর রমানাথ? সে কেন এমন করিয়া রজনীকান্তের, চারুবালার সর্ব্বনাশ করিল? বোধ হয় কতকটা মজা দেখিবার জন্য, কতকটা রজনীকান্তের মত নিরীহ ভাল মানুষকে দেখিতে পারিত না বলিয়া। আর একটা কারণ ছিল। আতরের জাতীয় স্ত্রীলোকেরা রজনীকান্তের মত পুরুষদিগকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া দিন যাপন করে, রমানাথ আবার আতরের মত অনেকের নিকট কর আদায় করে। রজনীকান্তকে ধরিবার জন্য ফাঁদ পাতিয়াছিল রমানাথ, প্রলোভন আতর। ফাঁদে পড়িয়া, হাতে পায়ে দড়ী জড়াইয়া যখন রজনীকান্ত বড় আছড়া আছড়ি করিতে লাগিল, তখন রমানাথ মুচ্‌কিয়া হাসিয়া সরিয়া গেল।

আতর রজনীকান্তকে লইয়া কি করিতেছিল? এমন অবস্থায় এমন রমণী যাহা করিয়া থাকে তাহাই করিতেছিল। রজনী-

কান্ত অগ্নিদগ্ধ নয়নে অন্ধ হইয়া তাহার চরণে নিপতিত হইয়াছিল। আতর ধীরে সুস্থে, হিসাব করিয়া, গণিয়া গণিয়া, তাহার নিকট টাকা লইত। মূঢ়, জ্ঞানশূন্য রজনীকান্ত কিছুই বুঝিতে পারিত না, বুঝিবার কখন চেষ্টাও করিত না। আতর তাহাকে ভুলাইবার সহস্র কৌশল জানিত, সহস্র রূপ ছলনায়, সহস্র রূপ বাক্‌চাতুরীতে তাহাকে বশীভূত করিয়া রাখিত। রজনীকান্তের নিকট যাহা ছিল সমস্ত আতরকে দিল। তাহার পর বিবাহ কালে শ্বশুরালয় হইতে যাহা পাইয়াছিল—ঘড়ী, আংটি, সোণার বোতাম প্রভৃতি নানাবিধ বহুমূল্য সামগ্রী—সব দিল। তাহার পর ধার করিল, অবশেষে আর ধারও পায় না। তাহাকে শূন্যহস্ত দেখিয়া আতর দুই চারি দিন কিছু বলিল না। তাহার পর এক দিন কথায় কথায় কথা পাড়িল। বলিল, "তোমার কি ইচ্ছা আমি না খেতে পেয়ে মরি?"

রজনীকান্ত থ হইয়া গেল। শুষ্ক মুখে বলিল, "সে কি, তুমি খেতে পাবে না কেন?"

"ঘাস খাব? ঘাস কিন্‌তেও পয়সা লাগে।"

রজনীকান্ত আবার তোৎলার মত একটু থামিয়া থামিয়া বলিল, "কেন, সে দিন যে দশ টাকা দিলাম?"

"ওরে বাপ্‌রে, কি ভাগ্যি দশ লক্ষ টাকা দাও নি। যে টাকা দিয়েছ তাতে দশ বছর আমার খাবার পর্‌বার ভাবনা থাক্‌বে না,"—রজনীকান্ত চুপ করিয়া রহিল দেখিয়া আতর সুর

বদলাইল, বলিল, “মাইরি ভাই, তোমায় কি আর মিথ্যা বল্‌চি? কত দিকে কত খরচ, তুমি যা দাও তাতে কুলায় না। এমন কোরে কত দিন চল্‌বে?”

রজনীকান্ত বলিল, “তা কি কোর্‌ব, আমার কাছে ত আর কিছু নেই।”

“কেন, ধার কর না!”

“ধার যত দিন পেয়েছি তত দিন কোরেছি, এখন আর কেউ দিতে চায় না।”

আতর সরিয়া বসিল। রজনীকান্ত বলিল, “সরে বস্‌লে কেন?”

আতর কৃত্রিম কোপ করিয়া বলিল, “যাও যাও, অত আর ভালবাসা দেখাতে হবে না!”

রজনীকান্ত অপরাধীর মত কহিল, “আবার কি হল?”

আতর সেইরূপ রাগিয়া বলিল, “হবে আবার কি! তা না হয় তুমি আর এখানে এস না, আমি আর কোন উপায় দেখ্‌ব।”

রজনীকান্তের মুখ শুকাইয়া গেল। বলিল, “ও কি কথা!”

“কেন, মন্দ কথা কি? তোমার কাছে কিছু না থাকে আর এখানে এস না।”

রজনীকান্ত বলিল, “আর টাকা কোথায় পাব? সব ত দিয়েছি।”

আতর থুঁতিতে অঙ্গুলি দিয়া, মাথা দোলাইয়া, নাকী সুরে

বলিল, "উঃ, অর্দ্ধেক রাজত্ব দিয়েচেন! এখন আর কিছু নেই, কোথায় পাবেন! আমাকে যেন নেকি পেয়েচেন। কেন, মাগের গায় গহনা নেই?"

রজনীকান্ত আশ্চর্য্য হইল, বলিল, "সে গহনা যে তার, আমায় দেবে কেন?"

আতর ফের রাগিয়া গেল, বলিল, "তার আবার কিসের, সব গহনা তোমার। তা পষ্ট কেন বলনা আমায় কিছু দেবে না।"

রজনীকান্ত বলিল, "আমার কি দিতে অনিচ্ছে, কিন্তু সে গুলা ত আমার কাছে নাই। যদি না দেয়?"

আতর বলিল, "দেবে না কেন, তার ঘাড় যে সে দেবে। তোমার জিনিস তোমায় দেবে না কেন?"

আতরের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া রজনীকান্ত গৃহ হইতে স্ত্রীর গহনা আনিতে গেল।

স্ত্রীর গহনা স্ত্রীর অঙ্গে বড় থাকিত না। রজনীকান্তের মাতা পুত্রের রকম সকম দেখিয়া পুত্রবধূর গহনা নিজের কাছে রাখিতেন, চারুবালার গায় বড় একটা গহনা থাকিত না। রজনীকান্ত বৈকাল বেলা বাড়ীর ভিতর গিয়া শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া স্ত্রীকে ডাকিল। চারুবালা অতি মাত্র বিস্মিত হইয়া ঘরে গেল। ম্লান মুখে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন ডাকচ?"

তাহার সেই বিষাদ-কালিমা চিহ্নিত মলিন মুখের দিকে রজনীকান্ত চাহিয়াই দেখিল না। সে আমিষলোলুপ মার্জ্জারের

ন্যায় স্ত্রীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। চারুবালার অঙ্গে কোথাও কোন আভরণ নাই, কেবল দুই হাতে দুই গাছি বালা। রজনীকান্ত স্ত্রীর দিকে চাহিয়া চাহিয়া অবশেষে বলিল, "তোমার চাবি দাও।"

চারুবালা একটীও কথা না কহিয়া অঞ্চল হইতে চাবি খুলিয়া দিল। চাবির কেন আবশ্যক তাহা সে জানিত। রজনীকান্ত চাবি লইয়া চারুবালার সিন্দুক বাক্স খুলিল। সিন্দুকে থান কতক সামান্য পরিধেয় বস্ত্র রহিয়াছে, আর কোথাও কিছু নাই। যাহা ছিল তাহার অধিকাংশ ইতিপূর্ব্বেই রজনীকান্ত বাহির করিয়া লইয়াছিল, অবশিষ্ট শ্বাশুড়ী ঠাকুরাণী নিজের কাছে সাবধান করিয়া রাখিয়াছিলেন। কোথাও কিছু না পাইয়া রজনীকান্ত ভ্রূ কুঞ্চিত করিল, জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার গহনার বাক্স কোথায়?"

চারুবালা বলিল, "মার কাছে।"

"কেন, তোমার গহনা তোমার কাছে থাকে না কেন?"

"মা নিজের কাছে রাখিয়াছেন।"

রজনীকান্ত শুষ্ক হাসি হাসিল। বলিল, "কেন, আমি নিয়ে নেব সেই ভয়ে তুমি বুঝি নিজে মার কাছে রেখে দিয়েছ?"

চারুবালা কলের মত বলিল, "না, তিনি নিজে নিয়েছেন, আমি কিছু বলি নি।"

রজনীকান্ত বিরক্তভাবে কহিল, "যাও গিয়ে তাঁর কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে এস।"

চারুবালা বাহিরে গিয়া তখনি ফিরিয়া আসিল, বলিল "তিনি দিলেন না।"

রজনীকান্ত চক্ষু আরক্ত করিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া উঠিল। "তোমার গহনা ত আমার বিষয়। আর কেউ রাখ্‌বার কে?"

চারুবালা বলিল, "তোমার ইচ্ছা হয় তুমি তাঁর কাছ থেকে চেয়ে নাও। আমি আর চাইতে পার্‌ব না।"

রজনীকান্ত সেইরূপ ক্রুদ্ধ স্বরে কহিল, "আচ্ছা, সে তখন এর পরে দেখা যাবে। তুমি হাতের বালা খুলে দাও।"

হাতের বালা খুলিয়া দিলে একেবারে শূন্যহস্ত হইতে হয়। এমন অমঙ্গলের কথা শুনিয়াই চারুবালা শিহরিয়া উঠিল। দুই হাতে দুই হাতের বালা চাপিয়া ধরিল, বলিল, "আমি শুধু হাত কোরে বালা খুলে দেব এ কথা বল্‌তে তোমার মুখে ঠেক্‌ল না?"

উত্তরে রজনীকান্ত কোন কথা না বলিয়া বলপূর্ব্বক চারু-বালার বালা খুলিয়া লইতে উদ্যত হইল। চারুবালার দক্ষিণ হস্ত সম্মুখে পাইয়া সেই হাতের বালা ধরিয়া টানিতে লাগিল। বাম হস্তে এক গাছা লোহা ছিল, দক্ষিণ হস্তে বালা ব্যতীত আর কিছুই ছিল না।

চারুবালা স্বামীর হস্ত ধরিল কিন্তু তাহাকে নিবারণ করিতে পারিল না। রজনীকান্ত বল পূর্ব্বক বালা খুলিয়া লইল। কিন্তু হাত কাড়াকাড়ি করিতে বালা রজনীকান্তের হাত হইতে ঠিক্-

রিয়া গড়াইয়া গেল। কোথায় গেল রজনীকান্ত তখন দেখিতে পাইল না। নিজের দক্ষিণ হস্ত শূন্য দেখিয়া চারুবালা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। বাম হস্তের অঙ্গুলি দ্বারা দক্ষিণ হস্তের মণিবন্ধ বেষ্টন করিয়া ধারণ করিল।

চারুবালার ক্রন্দনের শব্দ শ্রবণ করিয়াই রজনীকান্তের মাতা সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "বউ মা, কি হয়েছে?"

চারুবালা কথা কহিতে পারিল না। বামহস্তের অঙ্গুলি পরিবেষ্টিত শূন্য দক্ষিণ হস্ত শাশুড়ীকে দেখাইল।

শাশুড়ী কপালে করাঘাত করিলেন। পুত্রকে বলিলেন, "কি সর্ব্বনাশ করিতেই তুই বসেছিস্! বউমার হাতের বালা কোথায়?"

মাতাকে দেখিয়া রজনীকান্ত স্তব্ধ হইয়াছিল। এখন বলিল, "এই ঘরেই কোথায় পড়ে আছে, আমি কি জানি!" বলিয়া গৃহ হইতে বেগে বাহির হইয়া গেল।

রজনীকান্তের মাতা বধূকে জিজ্ঞাসা করিয়া বালা খুঁজিয়া আবার বধূর হস্তে পরাইয়া দিলেন। অনেকক্ষণ বসিয়া অমঙ্গল-ভয়বিহ্বলা পুত্রবধূকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

শূন্য হস্তে রজনীকান্ত আতরের নিকট ফিরিয়া গেল। আলুথালু বেশ, নিশ্বাস কিছু ঘন ঘন বহিতেছে, চক্ষের দৃষ্টি কিছু চঞ্চল। আতর তাহাকে একবার লক্ষ্য করিয়া দেখিয়া কহিল, "কি হল ?"

যাহা যাহা ঘটিয়াছিল কিছু অসংলগ্নভাবে রজনীকান্ত বলিল। আতর জিজ্ঞাসা করিল, "তার হাতের বালা জোর কোরে খুলে নিতে গেলে কেন ?"

রজনীকান্ত বলিল, "কেন, তুমিই ত বলেছিলে যে তার গহনা যদি না দেয় ত জোর কোরে নেবে !"

"তা বলে কি হাতের বালা কেউ সহজে দেয় ? না হয় রাত্রে ঘুমিয়ে পড়্‌লে খুলে নিতে।"

"আমি মনে কোরেছিলাম যে তোমার বড় দরকার তাই আর অপেক্ষা করি নি।"

"হুঁ, খুব সেয়ানা মানুষ ! এখন ?"

"এখন আর কি হবে ? বোধ হয় আর কিছুই পাওয়া যাবে না। হয়ত আমায় ঘরে ঢুকতে দেবে না।"

আতর বলিল, "তবে আর কোথাও দেখ।"

"কোথায় দেখ্‌ব ? আর কোথাও কিছু পাওয়া যাবে না।"

আতর বলিল, "তার পর আমার উপায় ?"

রজনীকান্ত নিজের পাদুকা নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। আতর বলিল, "দেখ, আর বেশী কথা বাড়াবার দরকার নেই। তোমার দৌড় বোঝা গিয়েছে, এখন তুমি আর বড় এ মুখো হইও না।"

রজনীকান্ত উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখ শুষ্ক, দৃষ্টি স্থির, ধীরে ধীরে বলিল, "তুমি আমায় চলে যেতে বল্‌চ ?"

নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া তীব্র ব্যঙ্গ স্বরে আতর কহিল, "হাঁ, বাঙ্গালা কোরে বল্‌চি। তা কি তুমি আজ নতুন এলে নাকি ? তোমার মত এমন কত এসেছে কত গিয়েছে। যত দিন টাকা দাও তত দিন আমি তোমার, তোমার টাকা ফুরাইলে আবার যে টাকা দিবে তার।"

রজনীকান্ত পূর্ব্বের ন্যায় বলিতে লাগিল, "তবে এই যে এত ভালবাসা—"

"সে টাকার।"

"তুমি আমাকে দেখিলে এত সুখী হইতে—"

"তোমার টাকা ছিল বলিয়া।"

"এখন আর আমার টাকা নাই—"

"সেই জন্য আর কিছুই নাই। বুঝ্‌লে ? এখন তুমি যাও, আমি অন্য উপায় দেখি।"

রজনীকান্ত বলিতে লাগিল, "এ কথা আমার কিছুতেই বিশ্বাস হইত না—"

আতর হাসিয়া উঠিল। সে হাসি বড় কঠোর, বড় নির্ম্মম, বড় বিদ্রূপপূর্ণ। বলিল, "স্পষ্ট কথায় আবার বিশ্বাস অবিশ্বাস কি? আমি ত তোমায় ভাল কথায় বল্‌চি আর এখানে এস না। তা আর কথা কাটাকাটি কেন?"

রজনীকান্ত আপনা আপনি মৃদু মৃদু বলিল, "আমি কোথায় যাব? আমার ত যাবার আর কোথাও জায়গা নাই।"

আতর পুনরায় পূর্ব্ববৎ হাসিল, বলিল, "এমন পাগল ত কোথাও দেখিনি! কেন, তোমার নিজের বাড়ী কি হল?"

"সে ত ছেড়ে তোমার কাছে এসেছি।"

"আবার আমায় ছেড়ে সেই খানে যাবে।"

রজনীকান্ত স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় আতরের দিকে চাহিয়া দেখিল। বলিল, "রমানাথ আমায় বলেছিল তুমি আমায় ভাল বাস, টাকার লোভ কর না।"

আতর বলিল, "তা ত বল্‌বেই, না হলে সে কেমন কোরে টাকা পাবে?"

রজনীকান্ত বলিল, "তুমি কি তাকে টাকা দাও?"

আতর বলিল, "তা না হলে সে তোমায় এখানে আন্‌বে কেন?"

রজনীকান্ত বলিল, "এখন বুঝ্‌তে পারচি। তা কি সত্য সত্য আর আমায় এখানে আস্‌তে দেবে না?"

আতর বলিল, "মিছা মিছি না কি? তোমার সঙ্গে আমি আর বক্‌তে পারি নে।"

আতর উঠিয়া গেল। রজনীকান্ত অনেকক্ষণ বসিয়া যখন দেখিল আতর আর ফিরিল না তখন নীচে নামিয়া বাড়ীর বাহির হইল।

রজনীকান্ত বরাবর রমানাথের বাড়ী গেল। রমানাথ এক গাছা নূতন ছড়ি কিনিয়া হাতে লইয়া দেখিতেছিল। ছড়ি গাছা পাকা বেতের, উপরে রূপা বাঁধান, রূপার উপর সুন্দর কারু-কার্য্য। সে গাছা রজনীকান্তের হাতে দিয়া রমানাথ জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন ছড়ি দেখ দেখি!"

রজনীকান্ত বলিল, "বেশ। তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি।" ছড়ি রজনীকান্তের হাতে রহিল।

রজনীকান্তের বিকৃত কণ্ঠস্বর শুনিয়া রমানাথ কিছু বিস্মিত হইয়া তাহার দিকে চাহিল। বলিল, "কি কথা?"

"আতর আজ আমাকে বিদায় কোরে দিয়েছে। সেখানে আবার যেতে বারণ কোরে দিয়েছে।"

রমানাথ তাহার অভ্যস্ত কৌতুকের স্বরে কহিল, "অমনতর রাগটা ঝালটা হামেশা হয়। ও কিছু নয়।"

রজনীকান্ত বলিল, "এবার রাগের কথা নয়। আমার কাছে আর টাকা নেই, সেই জন্য এ কথা।"

রমানাথ একবার কটাক্ষপাত করিয়া কহিল, "তা হলে ত

ভাই বল্‌বেই। ওদের সঙ্গে ত কেবল টাকার সম্বন্ধ। টাকা ফুরাইলে সম্বন্ধও ফুরাইল।"

রজনীকান্ত বলিল, "প্রথমে ত সে কথা আমায় বল নি। তুমি ত আমায় বরাবর বলেছ আতর আমায় যথার্থ ভাল বাসে, কেবল টাকার মায়া নয়।"

"সেই কথা কি তুমি বিশ্বাস কোর্‌তে না কি? তোমার মতন আস্ত হনুমান কখন দেখি নি।"

"তখন বিশ্বাস কোর্‌তাম। এখন ভুল ভেঙ্গেছে। আরও ছুটো একটা কথা জেনেছি। আমার দরুণ আতর তোমায় কত টাকা দিয়েছে?"

রমানাথের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। বলিল, "এ কি রকম তামাসা?"

"এই ছড়ি গাছার দাম কি আতর দিয়েছে?"

রমানাথ কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া কহিল, "আজ যে বড় তামাসার বাড়াবাড়ি দেখ্‌তে পাই।"

রজনীকান্ত বলিল, "আর একটু তামাসা কোর্‌ব। তুমি আমার জীবন বিষময় কোরে তুলেছ। যদি তুমি আমায় কুপথে না নিয়ে যেতে তা হলে আজ আমার এমন দশা হত না।"

রমানাথ করতালি দিয়া হাসিয়া উঠিল। "বেশ, বেশ, Bravo! বেড়ে বক্তৃতা কোর্‌তে শিখ্‌বে!"

রজনীকান্ত অল্প হাসিল, বলিল, "কেবল বক্তৃতা নয়। কাজও

কিছু শিখেছি। এই দেখ!" বলিয়া রমানাথের ছড়ি তুলিয়া রমানাথের পৃষ্ঠে সবলে প্রহার করিল।

চীৎকার করিয়া রমানাথ রজনীকান্তের হস্ত ধারণ করিতে উদ্যত হইল। দুই জনে প্রায় তুল্যবল, অন্য সময় হইলে হয়ত রমানাথ মার খাইয়া মারিতেও পারিত। কিন্তু এখন রজনীকান্ত অবলীলাক্রমে বাম হস্ত দ্বারা রমানাথের হস্ত ধারণ করিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা তাহার পৃষ্ঠে, বক্ষে, সর্ব্বাঙ্গে বেত্রাঘাত করিতে লাগিল। রমানাথ ত্রাহি ত্রাহি রবে চীৎকার করিতে লাগিল। অবশেষে যখন যষ্টি ভগ্ন হইয়া গেল তখন রজনীকান্ত পদাঘাতে রমানাথকে ভূতলশায়ী করিয়া গৃহের বাহিরে গমন করিল। রমানাথ উঠিয়া ধূলা ঝাড়িতে ঝাড়িতে রজনীকান্তের উদ্দেশে গালি পাড়িতে লাগিল।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

রজনীকান্ত ফিরিয়া আতরের গৃহে গেল। দেখিল, দ্বার বন্ধ, আঘাত করিলে কেহ সাড়া দেয় না। রজনীকান্ত অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল, অনেক ডাকাডাকি করিল, অনেকবার দ্বারে আঘাত করিল। অবশেষে একটা দাসী উপরের জানালা হইতে মুখ বাড়াইয়া বলিল, "তোমাকে আস্‌তে বারণ কোরে দিয়েচে আবার এসেচ! যাও, তুমি আর এ বাড়ীতে ঢুকতে পাবে না। বেশী গোল কর ত পাহারাওয়ালা ডেকে দেব।"

তখন অন্ধকার হইয়া আসিতেছে। পথে দুই চারি জন পথিক দাসীর কথা শুনিয়া, রজনীকান্তের নিকটে আসিয়া, তাহার মুখ ভাল করিয়া দেখিয়া, হাসিয়া চলিয়া গেল। রজনীকান্ত ধীরে ধীরে ফিরিল। ফিরিয়া কোথায় যাইবে? গৃহে ফিরিয়া যাওয়া অসম্ভব, রিক্তপ্রকোষ্ঠ পত্নীর ক্রন্দন তখনও রজনীকান্তের কর্ণে প্রবেশ করিতেছিল। কোথায় যাইবে তাহার কিছুই স্থিরতা ছিল না। কিছু দূর যাইতে যাইতে পথে একটী উদ্যান। সেখানে লোকসমাগম বিরল। রজনীকান্ত সেই উদ্যানে প্রবেশ করিল। একান্তে, তৃণাসনে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিল।

চিন্তা করিবার ক্ষমতা ইতিপূর্ব্বেই বিলুপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু পূর্ব্বস্মৃতি কোথায় যাইবে? একে একে সকল কথা স্পষ্ট করিয়া তাহার মনে উদিত হইল না কিন্তু প্রচণ্ড ঘূর্ণ্য বায়ুর ন্যায় অতীত তাহার সমক্ষে ঘুরিতে লাগিল। কি ছিল কি হইল! রজনীকান্তের কি দুঃখ ছিল, কিসের অভাব ছিল? সম্ভ্রান্ত বংশ, পিতা ধনী, সুখের পরিবার, নানা গুণে ভূষিতা, পতিপ্রাণা, তরুণী ভার্য্যা। এ সকল ত্যাগ করিয়া সে কিসের জন্য বারবনিতায় আসক্ত হইল? এরূপ আসক্তির এই ভিন্ন আর কি পরিণাম হইতে পারে? রজনীকান্তের এরূপ অধঃপতন হইবার কোন কারণ ছিল না। শিক্ষার দোষ, সঙ্গ দোষ তেমন কিছু ছিল না, কেবল রমানাথের দুই দিনের চাটু বাক্যে ও ছলনায় তাহার এই দশা হইল। একা রমানাথ কি করিত? যদি আতর এত প্রকার বশীকরণ কৌশল না জানিত, যদি রজনীকান্ত নিজে এরূপ নির্ব্বোধ ও লুব্ধ না হইত তাহা হইলে আজ তাহার কেন এমন দশা হইবে? ছিল যেখানে প্রফুল্ল, প্রস্ফুটিত কুসুম কানন, সেখানে আজ ব্যাঘ্রসর্পসঙ্কুল অন্ধকার অরণ্য। রজনীকান্ত ভাবিল, কে এমন করিল, কে তাহার জীবনের অমৃত ভাণ্ডে এমন করিয়া হলাহল পূরিয়া দিল? শুধু কি অদৃষ্টের দোষ? দোষ সম্পূর্ণ কি রজনীকান্তের নিজের নহে? কয় দিন হইল জীবন এমন নিশ্চিন্ত সুখের ছিল, ভবিষ্যতের আকাশ নির্ম্মল, সংসার স্নেহসুখপূর্ণ ছিল! কোথায় গেল সে নির্ম্মল প্রসন্ন আলোক,

কোথা হইতে আসিল এই সর্ব্বাবরণকারী মেঘরাশি, এই হৃৎকম্পকারী বজ্রনাদ, এই নয়নান্ধকারী বিদ্যুৎ বিকাশ! যে অতীত কালিকার কথা আজ তাহা লক্ষ যোজন দূরে, মহা সমুদ্রের পর পারে, অপ্রাপ্য, স্পর্শাতীত। যাহা গিয়াছে সমস্ত জীবনের অনুতাপেও ত তাহা ফিরিবে না। এ কলঙ্ক জীবন হইতে কেমন করিয়া প্রক্ষালিত হইবে?

রাত্রি হইতে লাগিল। রজনীকান্ত উঠিল। আবার আতরের গৃহদ্বারে গিয়া দাঁড়াইল। দ্বার পূর্ব্বের ন্যায় রুদ্ধ ছিল। এবার রজনীকান্ত দ্বারে করাঘাত করিল না, কাহাকেও ডাকিল না। দ্বার হইতে একটু দূরে পথের অপর পার্শ্বে একটা আলোক ছিল। আলোকের নীচে অন্ধকার। রজনীকান্ত সেই খানে দাঁড়াইল।

অল্লক্ষণ পরে একখানা গাড়ী আসিয়া আতরের গৃহদ্বারে দাঁড়াইল। গাড়ী হইতে উত্তম পরিচ্ছদ পরিহিত একটী যুবক নামিল। গৃহের দ্বার উদঘাটিত হইল। যুবক ভিতরে প্রবেশ করিলে পুনরায় রুদ্ধ হইল। গাড়ীখানা চলিয়া গেল।

রজনীকান্ত দাঁড়াইয়া রহিল। কিয়ৎকাল পরে দ্বিতালার জানালা মুক্ত হইল। জানালার সম্মুখে আতর এবং সেই নবাগত যুবক আসিয়া দাঁড়াইল। রজনীকান্তের সহিত আতর যেমন করিয়া দাঁড়াইত সেইরূপ দাঁড়াইল। রজনীকান্তের সম্মুখে যেরূপ বিলাস অনুরাগভঙ্গী করিত আতর সেইরূপ করিতে লাগিল।

যেমন করিয়া রজনীকান্তের অঙ্গে অঙ্গ হেলাইত সেইরূপ করিয়া নবপরিচিত যুবকের অঙ্গ স্পর্শ করিল। সেইরূপ করিয়া, তেমনি করিয়া কটাক্ষ করিয়া, হাসিল। রজনীকান্ত মনে করিত আতর তাহাকে যে চক্ষে দেখে এমন আর কাহাকেও দেখে নাই। আজ রজনীকান্তকে গৃহ বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া আতর কেমন করিয়া নিশা যাপন করিতেছে!

রজনীকান্ত দাঁড়াইয়া রহিল। জানালা আবার বন্ধ হইয়া গেল। সমস্ত দিন আহার হয় নাই সে কথা তাহার স্মরণ ছিল না। কোন কথাই স্মরণ হইতেছিল না। অন্তরে প্রচণ্ড অগ্নিদাহ হইতেছিল,চক্ষে কেবল আতর এবং সেই যুবককে দেখিতেছিল। রাত্রি গভীর হইতে লাগিল, ঈশান কোণে দুই এক বার বিদ্যুৎ স্ফুরিল। রজনীকান্ত নিমেষশূন্য লোচনে সেই রুদ্ধ জানালার দিকে চাহিয়া রহিল। বিদ্যুতের পর বাতাস উঠিল, তাহার পর দূরে মেঘ ডাকিল। অন্ধকার বাড়িতে লাগিল, মেঘ আকাশ ছাইয়া ফেলিল,মেঘগর্জ্জন ক্রমশঃ মাথার উপরে আসিল। ঝঞ্ঝা,মেঘ একত্র গর্জ্জিল। মুহুর্মুহু বিদ্যুৎ চমকিল, কড় কড় করিয়া বজ্র ডাকিল। সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি আসিল, অজস্র ধারায় বৃষ্টি পড়িতে লাগিল।

রজনীকান্ত দাঁড়াইয়া রহিল। এক দিন বৃষ্টি হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সে আতরের দ্বারে দাঁড়াইয়া ছিল, আজও সেই দ্বারের সম্মুখে, কিন্তু আজ দ্বার বন্ধ। বৃষ্টি হইতে রক্ষা পাইবার রজনীকান্ত কোন চেষ্টা করিল না, দাঁড়াইয়া ভিজিতে লাগিল।

বৃষ্টি থামিলে আর্দ্র বসনে দাঁড়াইয়া রহিল। রাত্রি শেষে সর্ব্বাঙ্গ শিশিরাক্ত হইল, কিন্তু রজনীকান্ত কিছুই অনুভব করিতে পারিতেছিল না। কখন শীতে কাঁপিতেছিল, কখন সর্ব্বাঙ্গ দাবানলের ন্যায় জ্বলিতেছিল, কিন্তু রজনীকান্তের কোন সংজ্ঞা ছিল না। তাহার বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হইয়াছিল, কেবল অন্তরে এক মাত্র চিন্তা জাগিতেছিল।

প্রভাত হইলে যে যুবক আতরের গৃহে রাত্রিবাস করিয়াছিল, সে দ্বার মুক্ত করিয়া বাহির হইয়া গেল। দাসী নিদ্রিতা ছিল, দ্বার রুদ্ধ করিবার জন্য কেহ আসিল না।

রজনীকান্ত সেই মুক্ত দ্বারে প্রবেশ করিয়া নিঃশব্দে অর্গল বন্ধ করিল। পাদুকা খুলিয়া পা টিপিয়া টিপিয়া উপরে উঠিল। আতরের শয়ন কক্ষের দরজা ভেজান ছিল। দরজা খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া রজনীকান্ত ভিতর হইতে দ্বার রুদ্ধ করিল।

স্খলিত বসনে, আলুলায়িত কেশে আতর শয্যায় শয়ন করিয়াছিল। ওষ্ঠাধরে তাম্বুল রাগ, নিদ্রায় স্থির নিশ্বাস প্রশ্বাস বহিতেছে। রজনীকান্ত কয়েক মুহূর্ত্ত দাঁড়াইয়া সেই নিদ্রিত রূপ দেখিল। তৎপরে অঙ্গ স্পর্শ করিয়া আতরের নিদ্রাভঙ্গ করিল। নিদ্রালসে চক্ষু মেলিয়া আতর রজনীকান্তকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি আবার এখানে এসেছ কেন ?"

রজনীকান্ত বলিল, "আজ এই শেষবার এসেছি, আর কখনও আস্‌ব না।"

"তোমার মত বেহায়া ত কখন দেখি নি! মানুষকে এক কথা বল্‌লে বুঝে গেল।"

রজনীকান্ত নিশ্বাস ফেলিল, বলিল, "বেহায়া না হলে কি আমার এ দশা হয়! কিন্তু আগে ত তুমি আমায় দেখ্‌লে এত বিরক্ত হতে না।"

আতর বলিল, "ভোর বেলা কি তুমি আমার সঙ্গে ঝগড়া কোর্‌তে এসেছ? দরজা খোলা পেয়ে চোরের মত বাড়ীতে ঢুকেছ!"

রজনীকান্ত বলিল, "যে কাল রাত্রে তোমার কাছে ছিল সেই আমায় দরজা খুলে দিয়েছে, নহিলে আমি দরজা খোলা পেতাম না।"

আতর লজ্জাহীনতার হাসি হাসিয়া কহিল, "তুমি কি কাল রাত্রে আমার ঘরে আড়ি পেতেছিলে?"

রজনীকান্ত কাহাকেও লক্ষ্য না করিয়া কহিল, "যেমন আমার অবস্থা, দুই দিন পরে এই হতভাগ্যেরও সেই দশা হইবে!"

আতর বিছানায় উঠিয়া বসিয়া, রাগিয়া বলিল, "দশা আবার কি! যার পয়সা তার আমি—পয়সা ফুরুল ত বশ্‌—আপনার রাস্তা দেখ। এ ত আর কিছু নতুন কথা নয়।"

রজনীকান্ত বলিল, "সে কথা আগে আমায় বল নি কেন?"

"আহা, আমার নেকাটী রে! উনি যেন আর কিছু জানেন না।"

"এখন সব জানি। কিন্তু তোমা হতে আর কারও সর্ব্বনাশ না হয় সে উপায় আমি কোর্‌ব।"

"কি কোর্‌বে ? আমার নামে নালিশ কোর্‌বে না খবরের কাগজে লিখ্‌বে ?"

অকস্মাৎ রজনীকান্ত বিকট হাস্য করিয়া উঠিল, কহিল, "তার চেয়ে সহজ উপায় আছে।"

সে হাসি শুনিয়া এবং রজনীকান্তের মুখ দেখিয়া আতরের অল্প ভয় হইল। বলিল, "তোমার সঙ্গে আমি আর বক্‌তে পারিনে। বাইরে যাই।"

শয্যা ত্যাগ করিয়া আতর বাহিরে যাইতে উদ্যত হইল। রজনীকান্ত তাহার হস্ত ধারণ করিয়া বল পূর্ব্বক নিবারণ করিল। "উঃ হু হু হাত ভেঙ্গে গেল," বলিয়া আতর রজনীকান্তকে গালি দিতে লাগিল। তাহার মত স্ত্রীলোক যেরূপ করিয়া গালি দিয়া থাকে, সেইরূপ গালি দিতে লাগিল।

রাত্রিকালেই রজনীকান্তের চিত্তবিকৃতি জন্মিয়াছিল। পকেটে কলম কাটিবার এক খানি ছোট ছুরী ছিল। সেই ছুরী বাহির করিয়া আতরের বক্ষে আঘাত করিল।—আতর চীৎকার করিয়া উঠিল, "বাবা রে! মেরে ফেল্লে রে!" প্রাণভয়ে রজনীকান্তের হস্ত হইতে ছুরী কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। রক্ত দেখিয়া রজনীকান্ত উন্মত্ত হইয়া উঠিল। আতরের অঙ্গুলি কাটিয়া গেল কিন্তু রজনীকান্তের হস্ত হইতে সে ছুরী কাড়িয়া লইতে

পারিল না। রজনীকান্ত বারম্বার আতরকে আঘাত করিতে লাগিল, সর্ব্বাঙ্গে ছুরী বিদ্ধ করিতে লাগিল। উষ্ণ শোণিত বেগে ছুটিয়া রজনীকান্তের মুখে চক্ষে লাগিল, শয্যায়, শয্যাতলে প্রবাহিত হইল। "মা গো, গেলাম গো, কেটে ফেল্লে গো!" শয্যার উপর পতিত হইয়া আর্ত্ত স্বরে আতর চীৎকার করিতে লাগিল। ক্রমশঃ কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হইয়া, রুদ্ধ হইয়া আসিল, দুই চারিবার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল, অবশেষে সমস্ত স্থির হইল।

আতরের দাসী নীচে শয়ন করিয়াছিল। আতর দুই চারি বার চীৎকার করিতেই নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গিয়া ছুটিয়া উপরে আসিল। দেখে দ্বার বন্ধ। রুদ্ধ গৃহের ভিতরে আতর আর্ত্তনাদ করিতেছে। দ্বারে ঘা দিয়া দাসী দরজা খুলিতে পারিল না। তখন, "ও গো তোমরা কে আছ গো, ছুটে এস গো, মেরে ফেল্লে গো!" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে নীচে ছুটিল। দরজা খুলিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া সেইরূপ চীৎকার করিতে লাগিল।

পথে কয়েকটী বৃদ্ধা গঙ্গাস্নানে যাইতেছিলেন, গুটী কতক বাবু বায়ু সেবনে বাহির হইয়াছিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "পাহারাওয়ালাকে ডাক।"

মোড়ের মাথায় পাহারাওয়ালা পাদচারণ করিতেছিল। দাসীর কথা শুনিয়া বলিল, "আরে, খুনকা মোকদ্দমা হয়! খুনী কাঁহা হয়?"

"কোথায় আর থাকবে, সেই ঘরেই আছে। শীঘ্র এস, তা না হলে পালিয়ে যাবে।"

"খুনীকো কেয়া একেলা পাকড়েগা?" বলিয়া পাহারাওয়ালা দুই চারি জন সঙ্গী দেখিতে গেল। আরও কয়েকজন জুটিলে সকলে মিলিয়া দাসীর সঙ্গে আতরের বাড়ী গেল। আতরের শয়ন গৃহ পূর্ব্বের ন্যায় রুদ্ধ। কোন শব্দ নাই।

পাহারাওয়ালারা প্রথমে দরজা ভাঙ্গিতে চায় না, অবশেষে দাসীর কথায় দরজা ভাঙ্গিয়া ফেলিল।

মুক্ত দ্বার দিয়া প্রভাতের সূর্য্যকিরণ গৃহে প্রবেশ করিল। শয্যা, গৃহ, রক্তে ভাসিয়া যাইতেছে। রজনীকান্ত শোণিতাক্ত দেহে শয্যায় বসিয়া নিশ্চিন্তভাবে পা দুলাইতেছে। শয্যার উপর আতরের মৃতদেহ পড়িয়া রহিয়াছে। নিকটে না গেলে ক্ষতচিহ্ন-সমূহ ভাল করিয়া দেখা যায় না।

নবপ্রবিষ্ট প্রভাত সূর্য্যকিরণে সেই রক্তময় গৃহ লোহিততর দেখাইতে লাগিল। রজনীকান্ত জবাকুসুম তুল্য চক্ষুযুগল তুলিয়া, চারিদিকে চাহিয়া, দ্বারে লোক দেখিয়া, হাসিয়া উঠিল।

পুলিসের লোক রজনীকান্তকে বাঁধিয়া লইয়া গেল।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

এই সকল ভয়ঙ্কর ব্যাপার যে শ্যামাচরণ ও মুক্তকেশীকে একেবারে স্পর্শ করে নাই এমন নহে। যেমন নদীর মধ্যস্থান দিয়া জাহাজ চলিয়া গেলে উভয় তীর পর্য্যন্ত তরঙ্গ উঠে এবং তীরলগ্ন নৌকা পান্সি ডুবিবার উপক্রম হয়, সেইরূপ এই সকল বড় বড় ঘটনা দূরস্থিত লোকদিগকেও চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল। বৈকুণ্ঠকে দেশে পাঠাইয়া দিয়া শ্যামাচরণ এক রকম নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। একবার মনে করিলেন সে বাড়ী ছাড়িয়া আর কোথাও যাইবেন। কিন্তু মুক্তর তেমন বেশী ত কোন অপরাধ নাই! পাশের বাড়ীর দুই একটী স্ত্রীলোক যেন একটু কি রকম কি রকম, এবং তাহাদের সঙ্গে মুক্তর সদা সর্ব্বদা থাকা যুক্তি-সঙ্গত নয়, কিন্তু অন্য বাড়ীতে উঠিয়া গেলে যে সে পাড়া ইহার অপেক্ষা ভাল হইবে তাহাই বা কেমন করিয়া জানা যাইবে? মুক্ত একটু হাসিখুসী ভাল বাসে বটে, একটু বেহায়া কি না সেই বিষয়ে শ্যামাচরণের সন্দেহ হইত। কিন্তু মুখ ফুটিয়া বড় একটা কিছু বলিতে পারিতেন না। মুক্তর সঙ্গে ত কোন মতে আঁটিয়া উঠিতে পারিতেন না, এই জন্য সহসা একটা ঝগড়া ঝাঁটির সূত্র-পাত তুলিতে পারিতেন না।

শ্যামারও আসা যাওয়া কমিয়া গিয়াছিল। যে দিন বৈকুণ্ঠ তাহার পাশে বসিয়া গান করিতেছিল এমন সময় শ্যামাচরণের সম্মুখে পড়িয়াছিল, তাহার পর ত এক মাস মুক্তদের বাড়ী যায় নাই। তাহার মনে বড়ই লজ্জা ও ঘৃণা হইয়াছিল। শ্যামাচরণ দেখিয়া কি মনে করিয়া থাকিবেন, আর কেহ দেখিলেই বা কি মনে করিত! হয়ত শ্যামার মনে কোন দোষের ভাব হয় নাই, কিন্তু লোকে কি সে কথা বিশ্বাস করিত? শ্যামা পরের চক্ষে আপনার আচরণ দেখিতে লাগিল, ও মনে মনে আপনাকে আরও ধিক্কার দিতে লাগিল। মুক্ত তাহাদের বাড়ী যাইত, কিন্তু চারুবালা ও স্বর্ণময়ী শ্বশুরবাড়ী গিয়া পর্য্যন্ত আর আগের মত বাড়ী ছিল না। শ্যামা কতক সমবয়সী বটে কিন্তু মুক্তকেশী এখন একটু তফাতে তফাতে থাকিত। শ্যামাচরণ তাহাকে সে দিনের যে বৃত্তান্ত বলিয়াছিলেন তাহা তাহার ভাল লাগে নাই। ইহাতে শ্যামা আরও মর্ম্মান্তিক লজ্জিতা হইত। শ্যামাচরণ বুঝিতে পারিলেন যে, দুই বাড়ীতে পূর্ব্বে যতটা ঘনিষ্টতা ছিল তাহার খানিকটা কমিয়া গিয়াছে। মুক্ত হাসি তামাসা যতই করুক তাহার মনে ত কোন পাপ ছিল না, অতএব শ্যামার কথা শুনিয়া একটু সন্দেহযুক্ত হইয়া সে একটু দূরে থাকিত। শ্যামাও ক্রমশঃ পিসিমার মত হইয়া উঠিতে লাগিল।

ক্রমে চারুবালার দুঃখের কথা অল্পে অল্পে উঠিতে লাগিল। প্রথম প্রথম কাণাকাণি তার পর সকল কথা প্রকাশ হইয়া পড়িল।

চারুবালার স্বামী বেশ্যাসক্ত হইয়াছে শুনিয়া মুক্তকেশী শ্যামাচরণকে দুই একবার বিদ্রূপ করিত, কিন্তু কথাটা বিদ্রূপ করিবার মত অধিক দিন রহিল না। এই কথাটার আন্দোলন হইতেছে এমন সময় এক দিন পাশের বাড়ীতে অত্যন্ত কোলাহল উপস্থিত হইল। মুক্তকেশী জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, রাত্রিকালে স্বর্ণময়ী গোপনে তাহার শ্বশুরালয় হইতে পলায়ন করিয়া আসিয়াছে! মুক্ত গিয়া স্বর্ণকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু কিছু জানিতে পারিল না। স্বামী এবং হয়ত শ্বশুরবাড়ীর অন্যান্য লোকেরা তাহার প্রতি অত্যাচার করে এরূপ সংশয় হইল, কিন্তু এরূপ বয়সে কি সাহস করিয়া শ্বশুরবাড়ী হইতে একা পলাইয়া আসিল? তার পর মুক্ত শুনিল যে স্বর্ণময়ীকে আর শ্বশুরবাড়ীতে লইয়া যাইবে না, ছেলের অন্য বিবাহ দিবে বলিয়াছে। কয়েক দিবস পরে স্বর্ণময়ীর মাতা কন্যাকে লইয়া গ্রামে চলিয়া গেলেন তাহাও দেখিল।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া মুক্তকেশীর প্রকৃতিতে একটা পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। যৌবনের চপলতার পরিবর্ত্তে কতকটা গাম্ভীর্য্য আসিল, স্বামীকে পূর্ব্বে যেমন কতকটা হতশ্রদ্ধা করিত সে ভাব গেল। শ্যামাচরণ এই নূতন ভাব দেখিয়া বিস্মিত ও পুলকিত হইলেন। মনের ভাব গোপন করিতে না পারিয়া মুক্তকেশীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার হঠাৎ এ রকম মনের ভাব হল কেন?"

অভ্যস্ত রঙ্গটা মুক্তকেশী সহজে ছাড়িতে পারিল না। একটু নেকা সাজিয়া বলিল, "আবার কি ক্রটী হল! আমার ত উঠ্‌তে বস্‌তে দোষ।"

"সে কি কথা! আমি কি দোষ বল্‌চি? এ ত খুব ভালই দেখ্‌ছি। আমি এ ক দিন তোমার ব্যবহার দেখে বড় খুসী হয়েছি।"

"তবে আগে ব্যবহার মন্দ ছিল?"

"আমি কি তাই বল্‌চি। তবে আগে—বুঝ্‌লে কি না—একটু চঞ্চল, ঠাট্টা তামাসা কিছু বেশী—তা সে বয়সকালে কোন দোষের কথা নয়।"

"তা না হয় আর আমি কখন হাস্‌ব না, সব সময় গোমড়া মুখ কোরে থাক্‌ব।"

শ্যামাচরণ হাসিয়া কহিলেন, "তোমার সঙ্গে আমি কোন কালে কথায় পারিনে তা এখন আর কেমন কোরে পার্‌ব? কিন্তু নিশ্চয় তোমার মনে কিছু হয়েচে।"

মুক্তকেশী কথার ছল ছাড়িয়া দিয়া কহিল, "সে কথা সত্য। কেমন কোরে হয়েচে জান? পাশের বাড়ী গিয়ে।"

শ্যামাচরণ কহিলেন, "আবার তামাসা!"

"না, তামাসা নয়। পাশের বাড়ীর দেখে শুনে এই রকম মনের ভাব দাঁড়িয়েছে। তোমাকে আমি মনে মনে যাই করি, মুখে বড় একটা ভক্তি কর্‌তাম না। তোমার কথা শুন্‌তাম না,

তোমায় কত সময় মিছিমিছি মন্দ কথা বল্‌তাম, তোমার মনে লাগ্‌ত কি না সে কথাও ভাব্‌তাম না। পাশের বাড়ীতে স্বর্ণ আর চারু, দুই জনে আমার চেয়ে ছোট, দুই জনে আমার চেয়ে সুন্দরী। কখন তাদের কোন দোষ দেখিনি, কারও মুখে তাদের নিন্দা শুনি নি। তবে তাদের এমন দশা কেন হল? চারুবালার স্বামী দিন রাত একটা বেশ্যার বাড়ী পড়ে থাকে, স্ত্রীর নাম করে না। স্বর্ণ বিশের কোন কষ্ট পেয়ে শ্বশুরবাড়ী থেকে পালিয়ে এসেছে, তার স্বামী তাকে আর নেবে না, আবার বিয়ে কোর্‌বে। এই সব দেখে শুনে কি মনে হয় বল দেখি? স্ত্রীলোকের স্বামী ভিন্ন অন্য গতি নেই। যতদিন স্বামী বর্ত্তমান, যত দিন তিনি সুচক্ষে দেখেন ততদিন মেয়েমানুষের সুখ। আমি পূর্ব্বজন্মে কত পুণ্য কোরে তোমার মত স্বামী পেয়েছি। এ কথা বরাবর জানি কিন্তু খুব ভাল করে মনে বুঝ্‌তে পার্‌তুম না। মনে একটু অভিমান ছিল, হয়ত মনে মনে তোমায় একটু অগ্রাহ্য কোর্‌তাম। এখন নিজের সেই সব শত শত অপরাধ মনে পড়চে। তুমি আমায় কখন দুর্ব্বাক্য বল নি, সকল সময়ে আমার রাগ অভিমান সহ্য কোরেচ। এই সকল মনে পড়ে আর মনে বড় আত্মগ্লানি হয়। আর বিধাতাকে মানাই যেন জন্ম জন্মান্তরে তোমায় আবার স্বামী পাই, তোমার মুখে হাসি দেখিয়া, তোমার পায় মাথা রাখিয়া, যেন মর্‌তে পারি। এ রকম কথা কখন তোমায় বলি নি, আজ এই প্রথম বল্‌লাম। কিন্তু এ গুলা মনের কথা, কত দিন থেকে তোমায় বল্‌ব বল্‌ব

মনে কোরে এত দিন বল্‌তে পারি নি। পাশের বাড়ী গিয়ে এই হয়েচে।"

মুক্তকেশীর মুখে এত বড় বক্তৃতা শুনিয়া, তাহার কথার ভাব বুঝিয়া, শ্যামাচরণ অবাক্ হইলেন। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া কহিলেন, "তোমার যে এত বুদ্ধি তা আমি জান্‌তাম না। তা আমি ত কখন তোমায় ইচ্ছা কোরে দুঃখ দিই নি।"

মুক্তকেশী তখন হাসিয়া বলিল, "কেমন, আর ও বাড়ীতে যাব কি না?"

শ্যামাচরণ কহিলেন, "যখন ইচ্ছা হয় যাবে, এখন আর আমায় কোন পরামর্শ দিতে হবে না, তুমি ত সব বুঝ্‌তে পার।"

সহসা পাশের বাড়ীতে ক্রন্দনের রোল উঠিল। "আবার বুঝি ওদের বাড়ীতে কি সর্ব্বনাশ হল!" বলিয়া মুক্তকেশী ছুটিয়া কি হইয়াছে দেখিতে গেল। গিয়া শুনিল, রজনীকান্ত সেই বেশ্যা-টাকে হত্যা করিয়া হত্যাপরাধে ধৃত হইয়াছে। চারুবালার মাতা কাঁদিতেছেন, চারুবালা শ্বশুরালয়েই আছে। শ্যামা মুক্তকেশীকে দেখিয়া আরও জোরে কাঁদিয়া উঠিল।

মুক্তকেশী যখন ফিরিয়া আসিল তখন কাঁদিয়া তাহার চক্ষু লাল হইয়াছে। স্বামীকে দেখিয়া তাহার ওষ্ঠাধর স্ফুরিল, চক্ষে আবার জল বহিল, শোক উথলিয়া উঠিল। শোক, সহানুভূতি, কতক আশঙ্কা, অনেকটা অনুতাপ, সব একত্রে। কি হইয়াছে,

জিজ্ঞাসা করাতে স্বামীকে সকল কথা বলিল। সেই করুণাপূর্ণ মুখ দেখিয়া শ্যামাচরণ মুক্তকেশীকে বক্ষে ধারণ করিয়া তাহাকে সান্ত্বনা করিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু মুক্তকেশী তাঁহার চরণতলে পতিত হইয়া তাঁহার চরণ ধারণ করিল, অশ্রুসিক্ত নলিনী নয়ন তুলিয়া কহিল, "তুমি আশীর্ব্বাদ কর যেন কোন অমঙ্গল আমায় স্পর্শ না করে, যেন তোমার চরণে আমার ভক্তি দৃঢ় হয়!"

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

স্বর্ণময়ীকে রাত্রিকালে উদ্যানে একা দেখিয়া হেমন্তকুমারের মনে যে শঙ্কার উদয় হইয়াছিল তাহা শীঘ্রই তিরোহিত হইল। তৎপরিবর্ত্তে লালসার উদয় হইল। যতদিন স্বর্ণময়ী অপ্রাপ্য ছিল, ততদিন তাহার কামনা স্বপ্নবৎ অলীক মনে হইত। এখন সে অনায়াসপ্রাপ্য, স্বপ্নসঙ্গিনী বিবেচনা করিবার কোন কারণ ছিল না। পূর্ব্বে যে মনের ভাব ছিল তাহাও বিকৃত হইয়াছিল। পূর্ব্বে দর্শনস্পৃহাই বলবতী ছিল, স্পর্শন নিতান্ত অসম্ভব বলিয়া সে বাসনা বড় মনে জাগিত না, কিন্তু এখন ক্রোড়াগত ঈপ্সিতের ন্যায় স্বর্ণময়ীকে বক্ষে ধারণ করিতে ইচ্ছা হইত, কেবল দর্শন করিয়া মন পরিতৃপ্ত হইত না। দর্শনও দুর্লভ, কারণ পূর্ব্বের সে দিন ত আর নাই, একেবারে সমুদয় পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। যাহা অসম্ভব ছিল তাহা ত এখন সহজ সম্ভব হইয়াছে, এখন স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কেন মিলনসুখে বঞ্চিত হইবে? এত দিন সমাজের অনুশাসন অনুত্তীর্য্য হিমানীশৃঙ্গ পর্ব্বতের ন্যায় হেমন্তকুমার এবং স্বর্ণময়ীর মধ্যে সদর্পে দাঁড়াইয়াছিল, স্বর্ণময়ীর কোমল কর-স্পর্শে তাহা অন্তর্হিত হইয়া গেল। আর ত সমাজকে নিন্দা করিবার প্রয়োজন নাই। সমাজের বিধিমতে এ পর্য্যন্ত স্বর্ণময়ী হেমন্ত

কুমারের প্রাপ্য নহে, কিন্তু হেমন্তকুমার যৌবনের উদ্দাম বলে বলবান, সমাজের ভয়ে সে ভীত হইবে কেন? তাহার যে বয়স সে সময়ে আশঙ্কা ক্ষণস্থায়ী, আকাঙ্ক্ষা দীর্ঘস্থায়ী। সমাজের উপর ক্রোধ যায় নাই, কারণ সমাজ বিপক্ষ না হইলে হেমন্ত-কুমারের সহিত স্বর্ণময়ীর বিবাহ হইত না কেন? যে বর্ব্বরের সহিত স্বর্ণময়ীর বিবাহ হইয়াছিল তাহার অপেক্ষা কোন্ অংশে অথবা কোন্ বিষয়ে হেমন্তকুমার নিকৃষ্ট? এখন কি সমাজের ভয়ে, কলঙ্কের বা ঘৃণার ভয়ে, স্বর্ণময়ী হইতে দূরে থাকিতে হইবে? হেমন্তকুমারের ইহাও মনে হইত যে, স্বর্ণময়ী তাহারই জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াছে। সে ত্যাগের প্রতিদান কেমন করিয়া করিতে হইবে? চিত্তের প্রণোদনা নানা প্রকারের, কিন্তু আসঙ্গলিপ্সাই বলবতী। সেই স্তব্ধ গভীর রাত্রে, বাপীতটে, নির্জ্জনে, স্বর্ণময়ীর সহিত সাক্ষাৎ—সে স্মৃতি কেমন করিয়া বিস্মৃত হওয়া যায়? প্রথমে সেই আশঙ্কাকম্পিত হৃদয়, লোকলজ্জার ভয়, তাহার পর স্বর্ণময়ীকে হারাইবার ভয়। চক্ষে চক্ষে সেই গাঢ় আলিঙ্গন, নিশ্চিন্ত প্রশান্ত সেই চিরবাঞ্ছিত মুখমণ্ডল, কেমন করিয়া ভুলিয়া যাইবে? পূর্ব্বে শুধু ছিল অনুরাগ, এখন হেমন্তকুমারের হৃদয় স্বর্ণময়ীর আশ্রয়স্থল। সমাজের নিষ্ঠুর কটাক্ষ বিদ্রূপ হইতে আর কে তাহাকে রক্ষা করিবে? কেবল আত্মসুখের তরে নহে, যেন কিছু দয়ার্দ্র চিত্তে হেমন্তকুমার সঙ্কল্প করিল যে, স্বর্ণময়ীকে আপনার গৃহের, হৃদয়ের ঈশ্বরী করিবে।

স্বর্ণময়ীর মনে বিশেষ আন্দোলন হয় নাই। হেমন্তকুমারের কথায় তাহার তিলমাত্র সংশয় জন্মে নাই। সে জানিত হেমন্তকুমারের যখন সুবিধা হইবে তখন তাহাকে লইয়া যাইবে। সমাজের তাড়নাকে সে তেমন ভয় করিত না। সমাজ ত তাহাকে ইতিপূর্ব্বেই একরূপ তাড়াইয়া দিয়াছিল। সে ইচ্ছাপূর্ব্বক সমাজের আশ্রয় হইতে পলায়ন করিয়া আসিয়াছিল। সে জানিত যে দুঃখের অবসান হইয়াছে, এখন সুখের উদয় হইবে। এই ভাবিয়া সে নিশ্চিন্ত, হর্ষফুল্ল মুখে ভবিষ্যতের পথ চাহিয়া বসিয়াছিল।

কিছু দিন পর্য্যন্ত চিঠি পত্র চলিতে লাগিল। অবশেষে সমস্ত আয়োজন করিয়া হেমন্তকুমার স্বর্ণময়ীকে লইয়া গোপনে চলিয়া গেল। তাহারা কোথায় গেল কেহ জানিতে পারিল না।

স্বর্ণময়ীর মাতা কন্যাকে লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গ্রামে গিয়াছিলেন। কন্যাকে হারাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কলিকাতায় ভ্রাতৃগৃহে ফিরিয়া আসিলেন। শেষ অবস্থায় তাঁহার অদৃষ্টে রোদনই লেখা ছিল।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

যখন পুলিসের লোকে রজনীকান্তকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যায় তখন সে উন্মাদের হাসি হাসিয়াছিল। উন্মত্ত অবস্থা না হইলে সে আতরকে হত্যা করিতে পারিত না। কিন্তু সে অবস্থা অধিকক্ষণ রহিল না। কারাগারে শৃঙ্খলবদ্ধ হইয়া ক্রমে তাঁহার লুপ্ত চৈতন্য ফিরিয়া আসিল। তখন তাহার চিত্তের যে অবস্থা হইল, তাহাতে সে অহর্নিশি মৃত্যু কামনা করিতে লাগিল। মৃত্যুকে ডাকিবার আর প্রয়োজন রহিল না। কেন না সে যে অপরাধ করিয়াছিল, রাজদ্বারে মৃত্যুই তাহার দণ্ড। কিন্তু আসন্ন মৃত্যু অপেক্ষা লজ্জা, ঘৃণার, অপমানের যন্ত্রণা সহস্রগুণে অধিক। অনুতাপের অবকাশ নাই, এমন উপায় নাই যে, ভবিষ্যতে জীবন অন্যরূপে অতিবাহিত করিয়া আত্মীয়বর্গের, সমাজের স্নেহ শ্রদ্ধার অধিকারী হইবে। যে পাপ করিয়াছে মৃত্যুই তাহার দণ্ড, জীবনই তাহার প্রায়শ্চিত্ত। স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সে প্রায়শ্চিত্ত করিবার ক্ষমতা নাই, রাজদণ্ডের অমোঘ বলে সে প্রায়শ্চিত্ত হইবে। আতরকে হত্যা করিয়া যদি রজনীকান্ত তৎক্ষণাৎ আত্মহত্যা করিতে পারিত, তাহা হইলে তাহাকে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্তে এই ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত না।

পুত্রের এরূপ অবস্থা হইলে পিতার অত্যন্ত শোক হইবারই

কিন্তু দীনবন্ধুর হৃদয়ে আরও আঘাত লাগিল। পুত্রের অন্ত্র সম্বন্ধে তাঁহার সংশয় জন্মিয়াছিল, তাহার কারণও ছিল, কিন্তু একটা বেশ্যাকে হত্যা করিয়া যে রজনীকান্ত হত্যাপরাধে অভিযুক্ত হইবে একথা দীনবন্ধু কখন স্বপ্নেও মনে করেন নাই। কেই বা করে? পুত্রের যাহা হইবার তাহা ত হইবেই, কিন্তু দীনবন্ধুর আর মুখ দেখাইবার কিম্বা মাথা তুলিবার উপায় রহিল না। সংবাদ পত্রে দেশ বিদেশে রাষ্ট্র হইয়া গেল, এমন ঘরে যে এরূপ কুলাঙ্গার পুত্র জন্মগ্রহণ করে এ কথা লইয়া সম্পাদকগণ ও পত্রলেখকগণ অনেক প্রকার আন্দোলন করিতে লাগিলেন। আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব, পরিচিত অপরিচিত সকলে আসিয়া তাঁহার সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিতে লাগিল, তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিল। পথে লোকে তাঁহাকে অঙ্গুলি দিয়া পরস্পরকে দেখাইয়া দিত। দীনবন্ধু যদি স্বয়ং হত্যাকারী হইতেন তাহা হইলেও তাঁহাকে ইহার অধিক লজ্জিত বা অপমানিত হইতে হইত না। তাঁহার অস্থিপঞ্জর চূর্ণ হইয়া গেল, মস্তক ধূলিধূসরিত হইল। তথাপি তিনি আপনার কর্ত্তব্য করিলেন। অকাতরে অর্থব্যয় করিয়া বড় বড় উকীল, কৌন্সিলী করিলেন, যে যাহা পরামর্শ দিল, যে দিকে অর্থ ব্যয় করিতে বলিল তাহাই করিলেন। কিন্তু কারাগারে গিয়া পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে কোন মতে স্বীকৃত হইলেন না।

আর চারুবালা? তাহার ত আর সকলই গিয়াছিল, কেবল

সধবা নাম টুকু বজায় ছিল। কেবল মাথার সিন্দুর টুকু আর হাতের লোহা গাছি ছিল। এইবার তাহাও যায়। কিসের বয়স তাহার? কবেই বা তাহার বিবাহ হইল, কয় দিনই বা সে স্বামীর ভালবাসা জানিল, কবেই বা তাহা হইতে বঞ্চিত হইল? তাহাতেও তাহার শাস্তি পূর্ণ হইল না। বৈধব্যই যদি তাহার ললাটে লেখা ছিল ত আর কি অন্য কোন উপায়ে তাহার বৈধব্য ঘটিতে পারিত না? এই বঙ্গদেশে তাহার মত অল্প বয়সে ত কত হতভাগিনী বিধবা হইতেছে কিন্তু এমন ভয়ঙ্কর দশা ত কাহারও হয় না। কালে, অকালে, মৃত্যু, অপমৃত্যু সচরাচর ঘটিয়া থাকে, কিন্তু ভদ্র সমাজে ভদ্র বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া হত্যা অপরাধে রাজদণ্ডে কাহার মৃত্যু হয়? যত দিন চারুবালা বাঁচিয়া থাকিবে, ততদিন তাহাকে যে দেখিবে, সেই বলিবে তাহার স্বামী একটা বেশ্যাকে খুন করিয়া ফাঁসি গিয়াছে। ইহা শুধু বৈধব্য নয়, শুধু যমযন্ত্রণা নয়, বোধ হয় কেবল নরকযন্ত্রণাও নয়। জীবনে মরণে, পৃথিবীতে নরকে, সকল যাতনা একত্র করিলেও বোধ হয় এরূপ যন্ত্রণার তুলনা হয় না। আজীবন—বিধবার দীর্ঘ জীবন—চারুবালাকে এই যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে।

বিচারে রজনীকান্ত বাতুল প্রমাণিত হইল না। লঘু দণ্ড বা অব্যাহতি পাইবার কোন কারণ প্রদর্শিত হইল না। যথারীতি বিচারের পর তাহার ফাঁসির হুকুম হইল।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

হেমন্তকুমারের বাঞ্ছা পূর্ণ হইল। নগর পরিত্যাগ করিয়া বহু দূরে এক খানি বাগান বাড়ী ভাড়া করিয়া স্বর্ণময়ীকে লইয়া বাস করিতে লাগিল। সে স্থান হইতে গ্রামও কিছু দূর। উদ্যানের ভিতর সরোবর, চারিদিকে ফল ফুল বৃক্ষের সারি। এই নিভৃতে সমাজের তাড়না নাই, লোকাপবাদের আশঙ্কা নাই। হেমন্তকুমার মনে করিল এই স্থানে সুখে থাকিবে।

স্বর্ণময়ীর মনে অধিক কথা উঠিত না। সে বাল্যকাল হইতে হেমন্তকুমারকে ভাল বাসিত, এখন তাহাকে পাইয়া সকল দুঃখ বিস্মৃত হইল। সে ইচ্ছাপূর্ব্বক সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিল। সমাজে ফিরিবার পথে নিজে কাঁটা দিয়া আসিয়াছিল। এখন একমাত্র আশ্রয় হেমন্তকুমার। মাতার নিকট যে কোন কালে ফিরিয়া যাইবে সে মুখও রহিল না। এ সকল কথা সে বেশ বুঝিতে পারিত। হেমন্তকুমারের প্রতি তাহার যে অনুরাগ ছিল, তাহার সহিত এখন সম্পূর্ণ নির্ভরতাও মিশ্রিত হইল।

কয়েক মাস বড় সুখে গেল। হেমন্তকুমার কিছু পুস্তকাদি সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিল, সময় সময় নূতন পুস্তক ক্রয় করিত। স্বর্ণময়ীর সহিত উদ্যানে ভ্রমণ, সরোবর তীরে উপবেশন, প্রণয়ের

লক্ষ কোটি নিরর্থ সম্ভাষণ এবং অবকাশ মত পুস্তকাদি অধ্যয়নে সময় বেশ কাটিতে লাগিল। স্বর্ণময়ী মনে করিত যে দুঃখের অবসান হইয়াছে, এখন চিরকাল এইরূপ নিরবচ্ছিন্ন সুখে কাটিবে।

কিন্তু তাহা ত কাটিল না। কিসে সুখ মানুষ যদি তাহা জানিত তাহা হইলে কি চিরকাল সুখের জন্য হাহাকার করিয়া ফিরিত? হেমন্তকুমার যে সুখ নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য বিবেচনা করিত, যে সুখের কল্পনাতেও সে সুখ পাইত, এখন পূর্ণমাত্রায় সে সেই সুখ পাইল। যে সমাজকে স্মরণ করিয়া সে ক্রোধে অন্ধ হইত, সে সমাজ তাহাকে কোন বাধা দিতে পারিল না। এখন ত সমাজের উপর ক্রোধের আর কোন কারণ নাই। সমাজের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই, কোন সংশ্রবও নাই। অথচ সেই কারণেই হেমন্তকুমারের সুখে প্রথম ব্যাঘাত জন্মিল। যে সমাজের উপর তাহার এত বিদ্বেষ, সেই সমাজ হইতে সে স্বতঃ বিচ্ছিন্ন হইয়া ক্রমশঃ অনুতপ্ত হইল। পূর্ব্বের বন্ধুগণ, আত্মীয় স্বজনের সহিত তাহার সম্পর্ক একেবারে ঘুচিয়া গেল কেন? স্বজাতির সম্মুখে উপস্থিত হইলে তাহাকে অপমান অনুভব করিতে হইবে কেন? অতীতের জন্য তাহার চিত্ত ক্রমে লালায়িত হইতে লাগিল। একা স্বর্ণময়ীকে লইয়া তাহার হৃদয় অধিক দিন পূর্ণ রহিল না। পূর্ব্ব পরিচিত বন্ধুদিগের অভাব বোধ করিতে লাগিল। যখন স্বর্ণময়ীকে পায় নাই তখন সমাজের উপর খড়্গা-

হস্ত। যদি স্বর্ণময়ীকে পাইল ত সমাজের কণ্ঠলগ্ন হইবার জন্য উৎসুক। মনে প্রতীতি জন্মিতে লাগিল যে, প্রণয়িনীকে প্রাপ্ত হওয়াই সম্পূর্ণ সুখ নহে।

এই রূপে অল্পে অল্পে অসুখের সূত্রপাত হইতে লাগিল। কেবল স্বর্ণময়ীকে লইয়া, পুস্তকাদি অধ্যয়ন করিয়া, হেমন্তকুমারের আর তৃপ্তি হয় না। ক্রমে অল্প অল্প সুরাপানের অভ্যাস হইল। বাড়াবাড়ি হইতেও অধিক দিন লাগিল না। স্বর্ণময়ী এই নূতন উৎপাত দেখিয়া ভয় পাইল, হেমন্তকুমারকে কত নিষেধ করিল, কিন্তু সে তাহা কোন মতে শুনিল না। মদ্যপানে হেমন্তকুমারের স্বভাবও পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। তাহার স্বাভাবিক কোমল প্রকৃতি কর্কশ ও কঠিন হইতে লাগিল। সুরাপানে চিত্তবিকৃতি জন্মিলে কখন স্বর্ণময়ীর প্রতি অত্যন্ত অনুরাগ প্রদর্শন করিত, কখন বিরক্তি প্রকাশ করিত, কখন কটু কথাও বলিত।

যেমন হেমন্তকুমারের প্রকৃতিতে পরিবর্ত্তন ঘটিতে লাগিল, স্বর্ণময়ীর সুখস্বপ্নও সেইরূপ ভাঙ্গিতে লাগিল। সে যেমন হেমন্তকুমারকে আত্মদান করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিল, হেমন্ত-কুমারের তেমন নিশ্চিন্ততা দেখিতে পাইল না। হেমন্তকুমারকে পাইয়া স্বর্ণময়ীর যেমন সকল অভাব মিটিয়াছিল, হেমন্তকুমারের সেরূপ মিটিল না। যেমন দিন যাইতে লাগিল সেইরূপ তাহাদের মনোমালিন্য বাড়িতে লাগিল। এমন আর কেহ নাই যে স্বর্ণ-ময়ীকে সান্ত্বনা দেয় অথবা তাহার মনে বল আনিয়া দেয়।

অনন্যগতি, অনন্যোপায় হইয়া স্বর্ণময়ী প্রাণপণে হেমন্তকুমারের মনস্তুষ্টির প্রয়াস পাইতে লাগিল, কিন্তু হেমন্তকুমার ভাল করিয়া তাহা বুঝিতে পারিল না। সে প্রথম হইতে আপনার মনের ভাব যদি ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখিত তাহা হইলে বুঝিতে পারিত যে, আত্মসুখই তাহার মুখ্য ও একমাত্র উদ্দেশ্য। আত্ম-সুখের জন্য স্বর্ণময়ীর কামনা, আত্মসুখের বিরোধী বলিয়াই সমা-জের উপর ক্রোধ, আবার আত্মসুখের অসম্পূর্ণতার জন্যই স্বর্ণ-ময়ীর প্রতি ঔদাসীন্য।

অনুরাগের পর যখন বিরাগ দেখা দেয় তখন সে ভাবের বৃদ্ধি বড় দ্রুত হয়। হেমন্তকুমারেরও তাহাই হইল। প্রথম কিছু দিন যদি রাগের মুখে কখন স্বর্ণময়ীকে একটা মন্দ কথা বলিত ত তাহার পর বড় অনুতাপ হইত, কিসে স্বর্ণময়ী তাহার দুঃখ বিস্মৃত হয় সেই চেষ্টা করিত। মনের সে ভাবও কিছু দিনে বিলুপ্ত হইল। একাকী এই নির্ব্বাসনে একমাত্র কিশোরী সঙ্গি-নীকে লইয়া বাস করা তাহার অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। ছায়ার মত স্বর্ণময়ী তাহার সঙ্গে থাকিত, সেই ছায়া অতিক্রম করিয়া হেমন্তকুমার দূরে আলোক দেখিতে পাইত। স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সে নির্ব্বাসিত হইয়াছে, নির্ব্বাসন হইতে স্বদেশে ফিরিবার আর উপায় ছিল না। এখন সে সমাজচ্যুত, সমাজের পূর্ব্বস্থান আর সে কখন অধিকার করিতে পাইবে না। সে যে মনে করিয়াছিল কেবল স্বর্ণময়ীকে পাইলেই বাঞ্ছনীয় আর কিছু থাকিবে না,

সমাজের প্রতি কখন দৃকৃপাতও করিবে না, সেইটা তাহার ভ্রম। ততটা মনের দৃঢ়তা তাহার ছিল না। এখন বুঝিতে পারিল, সমাজের বন্ধনও বড় শিথিল বন্ধন নহে।

গ্রন্থি যদি একবার শিথিল হইল ত খুলিতে কতক্ষণ? হেমন্তকুমার দিন দিন অসন্তুষ্ট ও বিরক্ত হইতে লাগিল, স্বর্ণময়ীর হৃদয় দিন দিন ভগ্ন হইয়া যাইতে লাগিল। হেমন্তকুমার কথায় কথায় স্বর্ণময়ীর ক্রটি দেখে, স্বর্ণময়ী গোপনে রোদন করে। বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ স্বামী এবং স্ত্রী হইলে এমন অবস্থাতেও কোনরূপ করিয়া দিন কাটিয়া যায়। আর পাঁচ জন লোক বলিবার কহিবার থাকে, সংসারে অপর দশটা ভুলিবার উপায় থাকে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুঃখ শোক সহ্য করিবার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু ইহাদিগের আর কোন উপায় ছিল না। নিজেদের লইয়াই সকল সুখ, নিজেদের লইয়াই সকল দুঃখ। এমন কেহ নাই যাহার সঙ্গে দুটা কথা কহিবে, যাহার কাছে দু দণ্ড বসিয়া নিজের দুঃখ ভুলিবে। সেই জন্য একবার অশান্তি উপস্থিত হইবামাত্র সেই অশান্তি বড় শীঘ্র বাড়িয়া গেল।

এক রাত্রে হেমন্তকুমার বসিয়া মদ্যপান করিতেছিল। স্বর্ণময়ী গৃহকর্ম্মে ব্যস্ত ছিল, দুই একবার সেই ঘরে আসিতেছিল। তাহাকে একবার দেখিতে পাইয়া হেমন্তকুমার বলিল, "দাঁড়াও। তোমায় একটা কথা বল্‌ব।"

স্বর্ণময়ী দাঁড়াইয়া হেমন্তকুমারের মুখের দিকে চাহিল। হেমন্ত-

কুমারের চক্ষু লাল, সম্মুখে গ্লাসে জলমিশ্রিত সুরা রহিয়াছে। অন্য কথা বলিবার পূর্ব্বে সে আর একবার পান করিল। স্বর্ণ তাহার কথার অপেক্ষা করিতেছিল। হেমন্তকুমার কহিল, "আমি দুই এক দিনের ভিতর কোথাও বেড়াতে যাব ভাব্‌চি।"

স্বর্ণ জিজ্ঞাসা করিল, "একা?"

"হাঁ, একা।"

"কোথায় যাবে?"

"তা জানি না।"

"কবে ফির্‌বে?"

"তা জানি না।"

"আমি কোথায় থাক্‌ব?"

"কেন, এই খানে। আর এখানে যদি মন না টিঁকে," হেমন্তকুমার একটু কঠোর হাসিল, "তা হলে তোমার মার কাছে যেও।"

স্বর্ণময়ীর কণ্ঠ রুদ্ধ হইল। সাশ্রুনয়নে কহিল, "মার কাছে যাবার আর কি আমার মুখ আছে?"

অমনি হেমন্তকুমার রাগিয়া গেল। "সে কি আমার দোষ?"

"না, তোমার দোষ নয়, আমারই যেন দোষ, কিন্তু সে পথে ত কাঁটা দিয়েছি।"

"তবে এই খানে থেকো।"

স্বর্ণময়ীর গলা আবার ধরিল। বলিল, "এখানে এক্‌লাটী

—তা সে যেন রইলাম। কিন্তু তুমি আমায় ফেলে চলে যেতে চাইচ কেন? তোমার কি আর আমাকে ভাল লাগে না?"

হেমন্তকুমার বলিল, "আমার আর কিছুই ভাল লাগে না। আর যদি তুমি কথা পাড়্‌লে তা হলে আর লুকিয়ে কি হবে? তোমার জন্যই আমার সব গেল—মান সম্ভ্রম গেল, বন্ধু বান্ধব গেল, লোকের কাছে মুখ দেখাবার যো রইল না।"

স্বর্ণ বলিল, "আর আমার?"

হেমন্তকুমার আরও রাগিয়া উঠিল। "বল না কেন আমার দরুণই তোমার যত দুঃখ। কেন, আমি কি তোমাকে বাড়ী ছেড়ে আস্‌তে বলেছিলাম? আমি কি তোমায় চিঠি লিখে রাত দুপুরের সময় বাড়ী থেকে বেরিয়ে আস্‌তে বলেছিলাম?"

গৃহের প্রদীপ স্বর্ণময়ীর চক্ষে নিভিয়া গেল। অতি কষ্টে অশ্রু সম্বরণ করিয়া কহিল, "আমি ত স্বপ্নেও কখন তোমায় কোন দোষ দিই নি। আমার জন্য তুমি কত কষ্ট পেয়েছ। কিন্তু এখন যদি আমাকে আর ভাল না লাগে, তা হলে আমি আর কি বল্‌ব?"

নেশার মুখে, অকারণে রাগ করিয়া, হেমন্তকুমার নানা কথা বলিতে লাগিল। এমন করিয়া লোকালয় হইতে মুখ লুকাইয়া, চোরের মত সে আর বাস করিতে পারে না। সে নানা দেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইবে। স্বর্ণময়ীকে সঙ্গে লইয়া কোথাও যাওয়া অসম্ভব, কারণ সে যেখানে যাইবে সেই খানেই তাহাদের কলঙ্ক

রটিবে, লোকে তাহাদিগকে সমাজ হইতে দূরে রাখিবে। স্বর্ণময়ী যখন গৃহত্যাগ করিয়া আসিল, তখন বুঝিয়া সুঝিয়া আসিল না কেন? এমন করিয়া নির্ব্বাসিতের মত কত দিন থাকা যায়?

হেমন্তকুমার এইরূপ বকিতে লাগিল ও মধ্যে মধ্যে সুরাপান করিতে লাগিল। যখন সে শয়ন করিতে গেল তখন মস্তক ও হস্তপদের কিছুই স্থিরতা নাই। শয্যায় শয়ন করিবামাত্র গভীর নিদ্রাভিভূত হইল। স্বর্ণময়ী তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ তাহাকে দেখিতে লাগিল। অবশেষে তাহার ললাটে চুম্বন করিয়া গৃহের দ্বার মুক্ত করিয়া বাহিরে আসিল।

জ্যোৎস্না রাত্রি। দাস দাসী সকলে নিদ্রিত। স্বর্ণময়ী ধীরে ধীরে গৃহ ত্যাগ করিয়া পুষ্করিণীর বাঁধান ঘাটে গিয়া দাঁড়াইল। চক্ষে অশ্রু নাই, মুখে বিষাদের চিহ্ন নাই। এতদিন যে অস্থিরতা, অনিশ্চিততা ছিল আজ তাহা মিটিয়া গিয়াছে। আজ তাহার সঙ্কল্প স্থির, আজ তাহাকে কি করিতে হইবে সে তাহা স্থির জানিয়াছে।

মাথার উপরে চন্দ্র হাসিতেছিল।

কোথাও কোন শব্দ নাই, বৃক্ষের পত্র পর্য্যন্ত স্থির। সোপানাবলী অবতরণ করিয়া স্বর্ণময়ী জলের ধারে দাঁড়াইল। জল নির্ম্মল, স্থির, জলে চন্দ্র প্রতিবিম্বিত রহিয়াছে। সেই খানে দাঁড়াইয়া স্বর্ণময়ী ভাবিতে লাগিল। তাহার কিছু মাত্র ব্যস্ত হইবার কোন কারণ ছিল না। আর এক রাত্রে এই রূপ [illegible]

নিকটে দেখিয়া যে সভয়ে তাহাকে বক্ষে টানিয়া লইয়াছিল সে আজ নিশ্চিন্ত নিদ্রিত, গৃহে অগ্নি লাগিলেও এখন তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইবে না। আর কাহার ভাবনা? সংক্ষিপ্ত জীবনের প্রতি চাহিয়া দেখিল, জীবনে ত তেমন কোন বন্ধন নাই! বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিবার অনেক কারণ আছে। হেমন্তকুমার তাহাকে লইয়া বিপদগ্রস্ত, বিরক্ত হইয়াছে, সে না থাকিলে সে নিশ্চিন্ত হয়। বিকারের তন্ময়তায় স্বর্ণময়ী দিব্য চক্ষে দেখিল, এই জন্যই তাহার জন্ম হইয়াছিল। জীবনে ত কোথাও শান্তি নাই, জীবনাতীতে শান্তি আছে। চিরকালই, বার বার, দুঃখ উপস্থিত হইলেই স্বর্ণময়ীর এই এক সাধ। সেই সাধ পূর্ণ হইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। মস্তকের উপরে চন্দ্রের স্থির হাসি, প্রকৃতির স্থির মূর্ত্তি, নিথর স্থির জল এবং স্বর্ণময়ীর চিত্তের স্থির বিকার, একত্রে মিশিল। জলের ধারে বসিয়া স্বর্ণময়ী অলঙ্কার উন্মোচন করিতে লাগিল। অঙ্গুলীতে বহুমূল্য হীরার অঙ্গুরী ছিল—হেমন্তকুমারের উপহার—খুলিয়া সিঁড়ীতে রাখিল। হাতের বালা, গলার হার খুলিল। কাপড় আঁটিয়া পরিল। তাহার পর ধীরে ধীরে, ধীরে ধীরে, নিঃশব্দে, জলে নামিল।

উপরে চন্দ্র হাসিতেছিল।

স্বর্ণময়ীর আর কোন সাধ মিটিল না, মিটিল কেবল সেই প্রথম জাগ্রত জীবনের সাধ—সরোবরের শীতল জলতলে শয়ন!

প্রভাতে ভৃত্যাদিগের কোলাহলে হেমন্তকুমারের নিদ্রা ভঙ্গ

হইল। তখনও তাহার মস্তিষ্ক জড়িত, চক্ষু লাল। বাটীতে স্বর্ণময়ীকে কোথাও দেখিতে পাইল না। বাহিরে আসি— দেখিল, পুষ্করিণীর তীরে দাস দাসী সমবেত হইয়াছে। নিকটে গিয়া দেখিল, বাঁধান ঘাটের উপর স্বর্ণময়ীর মৃতদেহ। পার্শ্বে অলঙ্কার পড়িয়া রহিয়াছে।

সেই দিবস হেমন্তকুমার সে গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া গেল। সেই অবধি সে নিরুদ্দেশ হইল।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

হরিদ্বারের পূর্ব্বে কনখল গ্রামে ভাগীরথী তীরে একখানি দ্বিতল গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া গোবিন্দ চন্দ্র পত্নী সুকুমারীর সহিত বাস করিতেছেন। দেশে ফিরিবার আর ইচ্ছা নাই।

শান্তি চারিদিকে। অতি মধুর, অতি গম্ভীর রবে, হিমাচল পরিত্যাগ করিয়া পুণ্যতোয়া জাহ্নবী নিম্ন প্রদেশে বহিয়া যাইতেছেন। অবিশ্রাম ঝর ঝর ঝর ঝর শব্দ—শান্তিপ্রদ, শীতল, শ্রবণাভিরাম। কিছু দূরে হরিদ্বারের সম্মুখে গঙ্গাদেবী দ্বিবেণী, দূরে নীল ধারা, তাহার পার্শ্বে চণ্ডী পর্ব্বত, বর্ষাকালে সেখানে যাইতে পারা যায় না। অপর দিকে তরুলতাসমাচ্ছন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বত। হরিদ্বারে ব্রহ্মকুণ্ডের উপর দিয়া ভীমগোড়া হইয়া হৃষীকেশে যাইবার পথ। যাত্রী আসিতেছে যাইতেছে, নানা দেশের লোক, নানা বেশ, নানা ভূষা। নিত্য পরিবর্ত্তন, কিন্তু এক দণ্ডের জন্য শান্তি ভঙ্গ হয় না।

সুকুমারী স্বহস্তে পাক করিতেন। বানরের বড় উৎপাত, এই জন্য রন্ধন গৃহে লোহার গরাদ বসাইয়া লইয়াছিলেন। তীর্থ স্থানে সামান্য গৃহস্থের মত তাঁহারা বাস করিতেন, কোন রূপ আড়ম্বর ছিল না।

প্রাতঃকালে সুকুমারী স্নান করিয়া আসিয়া আহ্নিক করিতে-ছিলেন। গোবিন্দ চন্দ্রও স্নানাদি সমাপন করিয়া পাঠ করিতেছিলেন। হস্তে বিষ্ণুপুরাণ। পড়িতে পড়িতে এই শ্লোকটী চক্ষে পড়িল—

বাঙ্মনঃ কায়িকৈর্দ্দোষৈরভিভূতাঃ পুনঃ পুনঃ।
নরাঃ পাপানামুর্দ্দিনং করিষ্যন্ত্যাল্পমেধসঃ॥

পূর্ব্ব কথা মনে পড়িল। কিন্তু এখানে ত পাপ নাই! এখানে আসিলে পাপ ত্যাগ করিতে শিখা যায়। যে শিক্ষা এখানে সেই শিক্ষা সর্ব্বত্র, কিন্তু সর্ব্বত্র এ পুণ্যপ্রবাহ নাই, এই নির্ব্বিরোধী শান্তি নাই, চিত্তশুদ্ধির এমন অবসর নাই, স্মৃতিতে পবিত্রতা উদ্রেককারী এত সামগ্রী নাই। জাহ্নবীর নিরবচ্ছিন্ন স্রোতোবেগে গোবিন্দ চন্দ্রের পূর্ব্বস্মৃতি প্রক্ষালিত, বিশুদ্ধ হইয়া গেল।

ত্রিতাপহারিণী, কলুষক্ষালিনী, পবিত্রসলিলা ভাগীরথীর তর তর ঝর ঝর ঘর ঘর প্রবাহ শব্দ দম্পতীর চিত্তে নির্ম্মলতা ও প্রসন্নতা উৎপাদন করিতে লাগিল।

সমাপ্ত।